প্রকাশনার ৩৬ বছর

অগ্রপথিক

সৃ জ ন শী ল মা সি ক

ছত্রিশ বর্ষ ❑ সংখ্যা ০১

জানুয়ারি ২০২১ ॥ পৌষ-মাঘ ১৪২৭ ॥ জমা. আউ.-জমা. সানি ১৪৪২

প্রধান সম্পাদক

আনিস মাহমুদ

সম্পাদক

মোহাম্মদ আনোয়ার কবির

প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর

ঢাকা-১২০৭

অগ্রপথিক

নিয়মাবলী

- অগ্রপথিক ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর সৃজনশীল মাসিক মুখপত্র।
- ইসলামের সুমহান জীবনাদর্শ প্রচার ও প্রসারে বিতর্কের ঊর্ধ্বে থেকে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, জীবনী, তথ্যমূলক ফিচারসহ সৃজনশীল লেখকদের গল্প, কবিতা, নাটক, স্মৃতিকথা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি,শিল্পকলা, অর্থনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক লেখা প্রকাশ এবং মননশীল পাঠক তৈরি করা অগ্রপথিকের প্রধান উদ্দেশ্য। পাশাপাশি বিশ্ব মুসলিম ঐতিহ্যের সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।
- উদ্দেশ্যের অনুকূলে যে কেউ তাঁর নির্বাচিত মূল্যবান লেখাটি অগ্রপথিক-এ প্রকাশের জন্য পাঠাতে পারেন, তবে অবশ্যই স্পষ্ট ও নির্ভুল হতে হবে। কাগজের দুই পৃষ্ঠায় গ্রহণযোগ্য নয়। অগ্রপথিক-এর ই-মেইল ঠিকানায়ও লেখা পাঠাতে পারেন। অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া হয় না। প্রকাশিত লেখার সম্মানী দেয়া হয়। লেখা সম্পাদকের বরাবরে পাঠাতে হবে।
- ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় বিক্রয় শাখা (বায়তুল মুকাররম, ঢাকা) সহ বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে অগ্রপথিকসহ অন্যান্য প্রকাশনা কিনতে পাওয়া যায়।

প্রচ্ছদ
ফারজীমা মিজান শরমীন

মূল্য : ২০ টাকা

যোগাযোগ
সম্পাদক
অগ্রপথিক
প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা- ১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫১৯
E-mail : ifa.agropothik@gmail.com

স ম্পা দ কী য়

বর্ষপূর্তি

একদিকে নতুন বছরে যাত্রা অপরদিকে পুরনো বছরগুলোকে মূল্যায়ন করে একটি পত্রিকার বর্ষপূর্তি হয়। অগ্রপথিক ৩৫ বছর পেরিয়ে এবার ৩৬-এ পা রাখলো। প্রথমেই এ কারণে মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহর পবিত্র দরবারে আমরা শুকরিয়া জানাই। পত্রিকার অগণিত পাঠক শুভানুধ্যায়ীদের প্রতিও আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। যে কোন বিচারেই ৩৫ বছর একটি পত্রিকার জন্য কম সময় নয়। একজন মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে যে রকম ৩৫ বছর বেশিদিন নয় আবার একইভাবে খুব কমও নয়। একইভাবে পত্রিকার জীবনেও ৩৬ বছরও সময়ের বিচারে মূল্যবান। আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশে যেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিল্প সাহিত্য সাংস্কৃতির একটি পত্রিকা ৫ বছর নিয়মিত প্রকাশ করার পরিসংখ্যানও খুব বেশি নেই সেখানে নিঃসন্দেহে অগ্রপথিক কর্তৃপক্ষের আগ্রহ ও পাঠকদের ভালোবাসায় নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এই নিয়মিত প্রকাশ কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকুক আল্লাহর দরবারে আমরা এই মুনাজাত জানাই।

অগ্রপথিক-এর এই নতুন বছরে পদার্পণ পাঠকদের কাছে আমাদের আরো দায়বদ্ধ করছে। ইসলামের সুমহান শিক্ষাকে সমুন্নত রেখে আমাদের প্রকৃত ইতিহাস ঐতিহ্য শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং প্রগতিশীল বিজ্ঞানমনস্ক প্রকৃত ইসলামিক শিক্ষাকে জনগণের সামনে তুলে ধরা অগ্রপথিক-এর অন্যতম লক্ষ্য। ধর্মীয় কুসংস্কার, কুমুণ্ডুকতাকে পরিহার করে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষানুযায়ী মদিনা

সনদ-এর আদলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাংলাদেশ গঠনে অগ্রপথিক জোরালো ভূমিকা পালন করবে। জন্ম থেকে এই ৩৬ বছরে অগ্রপথিক দেশে আধুনিক লেখক সাহিত্যিক সংস্কৃতিকর্মী সংস্কৃতিসেবী গড়ে তুলতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। অগ্রপথিক-এর এই ধারা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের পূর্ণাঙ্গতা অর্জন। ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সশস্ত্র যুদ্ধের ঘোষণা দেয়ার পরে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক তাঁর গ্রেফতারে জাতি আরো ইস্পাত দৃঢ় কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ দু'টিই ছিল সমগ্র জাতির আকাঙ্ক্ষা। সেই লক্ষেই পরিচালিত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ। আর তাই ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ বিজয়ের পর বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ছিল রূপকথার মহানায়কের প্রত্যাবর্তন। আমরা বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবর্ষেও এবারের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে বেশ কয়েকটি লেখা প্রকাশ করছি। প্রত্যাশা করি লেখাগুলোর মাধ্যমে পাঠকেরা দিবসটির তাৎপর্য সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাবেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত সোনার বাংলাকে গড়ার জন্য যখন তিনি একের পর এক কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করছিলেন তখনই রাষ্ট্রক্ষমতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় একদল কুলাঙ্গারের হাতে সপরিবারে শাহাদাৎ বরণ করেন। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে আমরা মহান রাব্বুল আলামিন-এর কাছে মুক্তিযুদ্ধের শহীদ, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে শাহাদাৎবরণকারী জাতীয় চারনেতাসহ এই দেশের জন্য জীবন উৎসর্গকারী সকল শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

পদ্মা সেতু ও মসলিন

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের নানাবিধও সাফল্য সারাবিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পদ্মা সেতু আমাদের অন্যতম অর্জন, অন্যতম অহংকার। ডিসেম্বর মাসে শেষ স্প্যানটি বসানোর মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান হয়েছে পুরো পদ্মা সেতু। মসলিন কাপড় বাঙালি জাতির অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্য। বৃটিশরা মসলিন বন্ধ করে দিয়েছিলো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদৃষ্টিতায় ১৭০ বছর পরে সেই মসলিন আবার ফেরত আসছে। জাতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্জন পদ্মা সেতু ও মসলিন নিয়ে আমরা এই সংখ্যায় দু'টি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছি।♦

সূচি

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী

আলোর পথযাত্রী ♦৯

অধ্যাপক ড. নূরজাহান বেগম

স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংহত হওয়ার দিন ♦১৪

খালেক বিন জয়েন উদদীন

১০ জানুয়ারি : বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ♦১৮

মুজিববর্ষ

কামাল লোহানী

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ধারা বর্ণনা ♦২৬

শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক

বঙ্গবন্ধুর মুক্তিতে ইন্দিরা, আবু সাঈদ চৌধুরীসহ বিশ্ব নেতাদের অবদান ♦৩১

মুজিববর্ষ

বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম

বঙ্গবন্ধুর সংসদ জীবনের শেষ দিনটি ♦৩৭

বর্ষপূর্তি

শামস সাঈদ

সময়ের সারথী অগ্রপথিক ♦৪৩

সালতামামি

খান চমন-ই-এলাহি

সালতামামি-২০২০ : ফিরে দেখা ♦৫০

আন্তর্জাতিক

মূল : জাস্টিন প্যারোট

অনুবাদ : মুস্তাফা মাসুদ

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর মাঝে আল্লাহর অস্তিত্ব-প্রসঙ্গ ♦৫৮

উন্নয়ন বিষয়ক নিবন্ধ

মিজানুর রহমান মিথুন

পদ্মা সেতু : এদেশের মানুষের শত বছরের স্বপ্নপূরণ ♦৭১

ডা. সুস্মিতা দেবনাথ

ফিরে আসছে সেই হারানো ঐতিহ্যবাহী মসলিন শাড়ি ♦৭৬

কবিতা

হাসান হাফিজ
শীতের সৌন্দর্য রয় আধেক অধরা ♦৮৯
প্রত্যয় জসীম
মানবমন ♦৯০
আনোয়ার কবির
ফেলে আসা জীবন ♦৯১
আ শ ম বাবর আলী
মন্দ-ভালো সতর্কতায় ♦৯২
বাবুল তালুকদার
সৃষ্টিকর্তার হুকুম ♦৯৩
শেখ দুলাল
অনন্ত সংসার ♦৯৪
সৌম্য সালেক
অসমতা ♦৯৫
মুহাম্মদ আবদুল্লাহিল বাকী
নীল খামে চিঠি ♦৯৬

গল্প

আবদুন নূর
নিয়তি ♦৯৭

মহিয়সী

গোলাম মোহাম্মদ আইয়ুব খান
নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী ♦৮০

সংগঠন

আখতার হামিদ খান
মুসলিম সাহিত্য সমাজ ♦১০৮

স্মরণ

গাজী সাইফুল ইসলাম
জালাল উদ্দিন রুমি ♦১১৭
দেলওয়ার বিন রশিদ
পল্লী বাংলার রূপকার কবি জসীম উদদীন ♦১২৪

পরশমণি

আল-কুরআন

১। হে রাসূল! পৌঁছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর বার্তা কিছুই পৌঁছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদের পথ প্রদর্শন করেন না। *(সূরা আল মায়িদা: ৬৭)*

২। হে মুমিনগণ! আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও। আর যখন তোমরা নামাযের জন্যে আহ্বান কর, তখন তারা একে উপহাস ও খেলা বলে মনে করে। কারণ, তারা নির্বোধ। বলুন, হে আহলে কিতাবগণ! আমাদের সাথে তোমাদের এছাড়া কি শত্রুতা যে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি আল্লাহর প্রতি, আমাদের উপর অবতীর্ণ গ্রন্থের প্রতি এবং পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থের প্রতি। আর তোমাদের অধিকাংশই নাফরমান। *(সূরা আল মায়িদা: ৫৭-৫৯)*

৩। যদি তারা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় তাদের বলে দাও, আমি এবং আমার অনুসারীগণ আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করেছি। আর আহলে কিতাবদের এবং নিরক্ষরদের বলে দাও যে, তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ? তখন যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তবে সরল পথ প্রাপ্ত হলো, আর যদি মুখ ঘুরিয়ে নেয়, তাহলে তোমার দায়িত্ব হলো শুধু পৌঁছে দেয়া। আর আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে সকল বান্দাহ। *(আলে ইমরান: ২০)*

৪। আল্লাহর আদেশ ব্যতিরেকে কোন বিপদ আসে না এবং যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরে সৎপথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলুল্লাহর আনুগত্য কর। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমার রাসূলের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া। *(আত-তাগাবুন: ১১-১২)*

আল-হাদীস

১। নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন: "যার মধ্যে তিনটি বিষয় বিদ্যমান থাকবে, সে ঈমানের অমৃতের স্বাদ আস্বাদন করবে; ১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার নিকট সবচেয়ে অধিক ভালোবাসার পাত্র হবেন। ২. কাউকে ভালোবাসলে সে ভালোবাসা কেবল আল্লাহর জন্যেই হবে। এবং ৩. কুফরের দিকে প্রত্যাবর্তন হওয়াকে এরূপভাবে অগ্রাহ্য করবে, যেরূপ সে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে করে থাকে।" *(বুখারী শরীফ)*

২। হযরত আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা) বলেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাগ তাআলা তার উপর দশটা রহমত নাযিল করবেন এবং তার আমলনামা থেকে দশটা পাপ মুছে দিবেন।"। *(ইবনে হিব্বান)*

৩। মহানবী (সা) বলেছেন, 'আল্লাহ সেই ব্যক্তি মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার কোনো বাণী শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে সেভাবেই অন্যের কাছে প্রচার করেছে।' *(তিরমিযী ও ইবন মাযাহ)*

৪। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-বিকালে মসজিদে যাবে আল্লাহ তাআলা তার জন্য যত যত সকাল বিকালে যাবে তার প্রত্যেকবারের পরিবর্তে বেহেশতে একটি করে মেহমানী প্রস্তুত করে রাখবেন। *(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)*

৫। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক জিনিসেরই পরিচ্ছন্ন করার উপায় রয়েছে, আর অন্তর পরিষ্কার করার উপায় হল আল্লাহর যিকির। *(বায়হাকী শরীফ)*

৬। মহানবী (সা) বলেছেন, আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্যই প্রেরিত হয়েছি। *(মুসনাদে আহমদ)*

স্ব | দে | শ | প্র | ত্যা | ব | র্ত | ন |

আলোর পথযাত্রী

র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী

২০২১ আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। জানুয়ারি দিয়ে যাত্রারম্ভ এ জয়ন্তীর। ১৯৭২ সালের এ মাসের ১০ তারিখে মৃত্যুঞ্জয়ী বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে আমাদের বিজয় পূর্ণতা পেয়েছিল। এই প্রত্যাবর্তনকে বঙ্গবন্ধু বর্ণনা করেন 'বন্দিদশা থেকে স্বাধীনতা, নিরাশা থেকে আশার' যাত্রা হিসেবে। ৮ জানুয়ারি তিনি ২৯০ দিন পাকিস্তানের কারাগারে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর প্রহর গুনতে গুনতে লন্ডন-দিল্লি হয়ে মুক্ত স্বাধীন স্বদেশের মাটিতে পৌঁছেছিলেন। ২৫ মার্চ ১৯৭১ তারিখে মধ্যরাতে তথা ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রচারের ব্যবস্থা করার অব্যবহিত পরেই তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন। গ্রেফতারের পর থেকে মুক্তির আগ পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি ছিলেন নিরবচ্ছিন্নভাবে। এ সময়ে তাঁকে কঠিন অবস্থার মধ্যদিয়ে অতিক্রম করতে হয়েছে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট তাঁকে

পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রধানতম বা পয়লা নম্বরের শত্রু ঘোষণা করে তাঁর বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতার অভিযোগে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় প্রহসনের বিচারের ব্যবস্থা করেছিল (লক্ষণীয় যে, এন্তার বিপ্লবী আর ঘোষক দাবিদারের উপস্থিতি সত্ত্বেও সেদিন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী প্রহসনের বিচারে শেখ মুজিবের ফাঁসির ব্যবস্থা করেছিল)। পাকিস্তানের নির্জন প্রান্তরের এক নির্জনতম কারাপ্রকোষ্ঠে নিঃসঙ্গ সময় কেটেছে এ সময় তাঁর। পৃথিবীর সাথে ন্যূনতম সংযোগ ছিল না। কোনো খবরাখবর পেতেন না। কী ঘটে যাচ্ছে তাঁর প্রিয় স্বদেশে, সে সম্পর্কে তাঁর সামান্যতম কোনো ধারণা ছিল না বা সামান্যতম ধারণা পাওয়ারও কোনো সুযোগ ছিল না।

২৬ মার্চের পর থেকে ৮ জানুয়ারি মুক্তির আগ পর্যন্ত পাকিস্তানের ইতিহাসে ঘটে যাওয়া বা বাংলাদেশের বুকে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা সম্পর্কে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতে পারেননি এবং এমন অবস্থায় থেকেও তিনি এমন কোনো পদক্ষেপ নিতে আদৌ আগ্রহী হননি যা তাঁর মুক্তিকে ত্বরান্বিত করতে পারত বা কার্যত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও পাকিস্তানের বিভাজনকে নস্যাৎ করে দিতে পারত। যে সময়টার কথা আমরা এখানে আলোচনা করছি সে সময়টার কথা বিশ্বের তাবৎ লেখনি একত্র করেও সঠিকভাবে কারো উপলব্ধিতে পৌঁছে দেয়া সম্ভব নয়। ঘটনার ঘনঘটায় সেদিন যারা উপস্থিত থেকে মুক্তিযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন (এমনকি বিপক্ষেও যারা ছিল), পাকিস্তানের ভাঙন প্রক্রিয়া দেখছিলেন অবরুদ্ধ স্বদেশভূমিতে অথবা ভারতের মাটিতে আশ্রয় নিয়ে অথবা সুদূর পাকিস্তানে আটকা পড়ে তারাও সেই দুঃসময়ে, অনেক সময়ে এই ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়তেন যে, কবে এই দুঃসময়ের অবসান ঘটবে। অনেকে অধৈর্য হয়ে পাকিস্তানের ফাঁদে পা দিয়েছে, অনেকে স্বাধীনতা আদৌ অর্জিত হবে কি-না, সন্দেহের দোলাচলে দুলেছেন। আর এই সব হয়েছে চোখের সামনে, ঘটনা ঘটে চলেছে দেখতে পেয়েও। এমনকি প্রবাসী সরকারের অন্যতম মন্ত্রী খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র অথচ প্রভাবশালী গোষ্ঠী এসব সন্দেহ ও অধৈর্যকে পুঁজি করে, এমনকি শেখ মুজিবের মুক্তির ইস্যুকে পুঁজি করে পাকিস্তানের সাথে একটা সমঝোতায় পৌঁছা যায় কিনা সে মতে উদ্যোগী হয়েছিল। এই বৈরী অবস্থার ভেতর দিয়ে সমগ্র বাংলাদেশ চলছিল। অন্যদিকে পাকিস্তানি নির্যাতন, নিপীড়ন, যুদ্ধাপরাধ সকল মাত্রা ছাড়িয়ে অব্যাহত গতিতে চলছিল। একটা সময় এমন হয়ে উঠেছিল যে, অতি বড় আস্থাশীল ব্যক্তিও স্বাধীনতা যেন এক সদূরপরাহত বিষয় অথবা স্বাধীনতা যেন এক সোনার হরিণ। আর এ সবই হচ্ছিল উপস্থিত পক্ষ-বিপক্ষ উভয়েরই তখনকার উপলব্ধি।

কিন্তু এই ঘটনার ঘনঘটা সম্পর্কে যিনি আদৌ কোনো কিছু জানছিলেন না, তিনি কিন্তু মুহূর্তের জন্যও জনগণের ওপর থেকে আস্থা হারাননি বা স্বাধীনতার সম্ভাবনা নিয়েও মনের অজান্তেও সন্দিহান হননি। জনগণের উপর অবিচল আস্থা, স্বাধীনতার প্রশ্নে আপোসহীন অঙ্গীকার, সংগ্রামের অজেয় চেতনা তাঁকে কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে ফাঁসির রজ্জুর হাতছানির মধ্যেও বেঁচে থাকার অফুরান সাহস জুগিয়েছিল। তিনি কখনো বিশ্বাস হারাননি। কখনো তিনি বিচলিত বোধ করেননি। তাঁর অমিত সাহস তাঁকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রহসনের বিচারের রায়কে হাতের তুড়িতে উপেক্ষা করতে প্রেরণা দিয়েছে।

পাকিস্তানের বন্দিদশা থেকে মুক্তিকে তাই বঙ্গবন্ধু দেখেছেন 'অন্ধকার থেকে আলোর পথের যাত্রা' এবং 'দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি'র অভিযাত্রা' হিসেবে। একজন মানুষ যিনি নির্জন প্রকোষ্ঠে নির্মম নিঃসঙ্গতায় সময় অতিক্রম করেছেন, ঘড়ির কাঁটার বহমানতা ছাড়া যাঁর জীবনে সময় তখন থমকে ছিল, স্বাধীনতার সংগ্রাম আর মুক্তিযুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে যিনি কিছুই অবহিত হচ্ছিলেন না, স্বাধীনতার প্রশ্নে সেই মানুষটির অবিচলতা আজকের দিনে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে বসে অনেক অর্বাচীনের ধারণায় নাও আসতে পারে। সেই সময়ের যারা সাক্ষী তাদের কেউ কেউ যখন এ নিয়ে নানা কথা বলতে চেষ্টা করেন, তখন আমরা যারা সক্রেটিসের সময়ের নই তারা সক্রেটিসের সময়ের অবস্থাটা অথবা মোনাফেক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের অবস্থানটা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

একটি আন্দোলনের মধ্যমণি যখন তাঁর সকল সহকর্মীকে নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে প্রতিরোধযুদ্ধ গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়ে নিজে সে পথে না যেতে চান, তখন সহজেই তাঁর দুঃসাহসী সিদ্ধানের সুদূরপ্রসারী ভাবনা বুঝতে পারা যায়। একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা প্রকাশ্যে নানাভাবে সেই '৭০-এর ঘূর্ণিঝড়ের সময় হতে সমগ্র বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে আসছিলেন, যিনি ৭ মার্চের বক্তৃতায় 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়তে', 'ভাতে মারব পানিতে মারব' বলে দেশবাসীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর মতো একজন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা যখন একটি অখণ্ড দেশকে দ্বিখণ্ডিত করে খণ্ডিত অংশের স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুতি নেন তখন তাঁকে নানা কৌশল এবং আড়ালের আশ্রয় নিতে হয় এটাই স্বাভাবিক। তাই সবকিছু বুঝেও যারা না-বোঝার ভান করে সেসব অর্বাচীনদের অবিমৃশ্যকারিতা নিয়ে আমরা তেমন একটা কথা বলতে চাই না। ওরা জ্ঞানপাপী অথবা সেই গোষ্ঠীর লোক যারা নিজেদের অপারগতাকে ঢাকা দিতে নানা কূটচালের আশ্রয় নেয় অথবা তারা সেইসব গোষ্ঠীর লোক যারা সেই সময়ে বিপক্ষে অবস্থানে থাকার অপরাধ ঢাকতে গিয়ে নানা বাহানা খুঁজে বেড়ায় তারা। বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে দৌড় শুরু করতে যে আনুষাঙ্গিক প্রস্তুতি থাকে, তাকে যারা হিসেবে নিতে চায় না,

সেইসব লোকেরাই বলে যে, মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নিতে কোনো আশ্রয় নেয় অমনি তাদেরকে জামাই-আদরে অভ্যর্থনা জানানোর দায় ঠেকেছিল কারো। কোনো রকম পূর্ব সমঝোতা ব্যতীতই আমাদের প্রতিবেশী ভারত ও অন্যান্য মিত্রগণ আমাদের সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছিল এমনটা যারা ভাবেন তাদের ভাবনাটা যে বাতুলতা মাত্র তা তারা বুঝতে পারেন না। সর্বক্ষণ শেখ মুজিবের ছিদ্রান্বেষণে যারা ব্যস্ত তারা ছাড়া এমনটা কেউ প্রচার করে না। যারা বঙ্গবন্ধুকে ছোট করে নিজেদেরকে বড় করে উপস্থাপন করতে চায়, অথবা যারা বঙ্গবন্ধুকে খাটো করে অন্য কাউকে বড় করে দেখাতে চায়, বাস্তবে সেইসব বামনেরা কখনো বড় হয় না। বরং আরো ছোট হয়, এটা তারা বুঝতে সক্ষম নয়।

২৫ মার্চের পর পাকিস্তান রাষ্ট্র তার প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের যিনি জনক সেই শেখ মুজিবকে বন্দি করে প্রহসনের বিচারের দাঁড় করিয়েছিল। অসম্ভব অকল্পনীয় মানসিক চাপ প্রয়োগ করেছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কখনো মচকাননি বা ভেঙেও পড়েননি। নিজ লক্ষ্যে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রেখে তিনি পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে এক অসম ও সুকঠিন মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ চালিয়ে গেছেন। একদিকে তাঁর প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ ও দেশবাসী প্রবাসী বিপ্লবী সরকার গঠন করে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে গেছেন, অন্যদিকে তিনি নিজে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে একা লড়ে গেছেন হিমালয়ের অটলতা নিয়ে। তাঁর সামান্যতম পদস্খলন আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে বিপথগামী করতে পারত এবং আমাদের স্বাধীনতাকে করে দিতে পারত ব্যর্থ। আর এখানেই মুজিব- নেতৃত্বের বিশালতা, সৌন্দর্য আর মহিমা নিহিত। নিঃসঙ্গ এক মানুষের নির্জন কারা প্রকোষ্ঠে থেকে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া মহামতি নেলসন ম্যান্ডেলাই এই যুদ্ধে তাঁর একমাত্র জুড়ি।

অবশ্য দুটি দেশের সংগ্রামের পটভূমি সম্পূর্ণ ভিন্ন। দক্ষিণ আফ্রিকা দক্ষিণ আফ্রিকাই আছে। লড়াইটা হচ্ছিল স্বদেশে পরবাসী না হয়ে নিজেদের মতো করে দেশটাকে গড়ে নেওয়ার। আর বাংলাদেশের লড়াই ছিল একটি দেশকে আরেকটি দেশের জবরদখল থেকে মুক্ত করে সম্পূর্ণ নতুন একটি পরিচিতি দেবার। শুধু মানুষের স্বাধীনতাই নয়, ভূখণ্ডের পরিচিতি ও মানচিত্রও এখানে পরিবর্তন হয়েছে এবং বিষয়টা বেশ জটিলই ছিল। ২৫ মার্চ, ৭১ পর্যন্ত দেশটি ছিল আরেকটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের অবিচ্ছিন্ন অংশ। দু-দশক আগেও দেশটিকে তার পূর্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবার আদৌ কোনো সুযোগ ছিল না। এমনকি মনের অগোচরেও কেউ এমনটা ভাবতে সাহসী ছিলেন না (দু-চারজন ব্যতিক্রম ছাড়া, যাঁদের অন্যতম ছিলেন তরুণ মুজিব)। এইসব বিষয় বিবেচনায় রেখেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসকে সঠিক আঙ্গিকে দাঁড় করাতে হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০ জানুয়ারি ১৯৭২-এ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার

মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এক নবরূপ অর্জন করে। একটি স্থিতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠা, একটি অস্থির পরিস্থিতিকে সামাল দেয়ার ক্ষেত্রে তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন জাদুমন্ত্রের মতো কাজ করেছিল। অন্যথায় আজও হয়তো আফ্রিকার অনেক বিবদমান গোষ্ঠী যেমনি নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে লিপ্ত হয়তো তেমন একটি সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। কেননা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়ও বিভিন্ন সমর-নেতা ও বিভিন্ন মতাদর্শগত গোষ্ঠীর বিরোধের কথা অজানা নয়। অথবা এমনটাও অস্বাভাবিক কিছু নয় যে, তাঁর অনুপস্থিতি আমাদের ভূখণ্ডে এখনো মিত্রবাহিনীর উপস্থিতিকে অনিবার্য করে তুলত। ১০ জানুয়ারি থেকে ১৭ মার্চ কিন্তু লম্বা সময় নয়। মাত্র এই সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয়তা এবং তাঁর প্রজ্ঞাবান কৌশলকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের মাটি থেকে মিত্রবাহিনীকে সরিয়ে নিতে দুর্দিনের বন্ধু ও মিত্র ভারত-রাষ্ট্রকে সম্মত করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটা যে কতবড় সাফল্য তা আজকের অবস্থানে দাঁড়িয়ে বোঝা সহজ বিষয় নয়।

মুক্তির কয়েক যুগ পরও যখন স্বদেশের মাটিতে মিত্রবাহিনীর চলে যাওয়া একমাত্র সম্ভব হয়েছিল শেখ মুজিবের উপস্থিতির কারণেই। শুধু তাই-ই নয়, তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বাংলাদেশকে বড় ধরনের প্রতিহিংসামূলক হত্যাযজ্ঞ থেকেও রেহাই দিয়েছিল।

সামগ্রিক পর্যালোচনায় একথা আজ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে, একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠতে তাঁর স্বদেশভূমিতে ফিরে আসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তিনি ছিলেন জাতির কাছে ছিল একটি বড় প্রেরণা। দীর্ঘ সংগ্রাম, ত্যাগ তীতিক্ষা, আন্দোলন ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার প্রশ্নে বাঙালি জাতি যখন কঠিন এক বাস্তবতার মুখোমুখি তখন পাকিস্তানের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন আমাদের স্বাধীনতাকে সকল প্রভাবমুক্ত রাখতেও সহায়তা করেছে। বাংলাদেশ তার নিজস্ব পরিচিতি নিয়ে– ভূখণ্ডগত, সংস্কৃতিগত, ভাষাগত ও প্রভাবগত সকল বিবেচনায়– যে আজ বিশ্ব-মানচিত্রে এক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলেছে তা সম্ভব হয়েছে তাঁর– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কারণেই। তাই তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি যে (পাকিস্তান থেকে তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন হচ্ছে) অন্ধকার থেকে আলোর পথে যাত্রা, দাসত্ব থেকে মুক্তির পথে যাত্রা, যথার্থই একটি সঠিক মূল্যায়ন। নিজ বিশ্বাস, মূল্যবোধ, দেশের মানুষ ও দেশের মুক্তির প্রতি অবিচল অটল আস্থাবান এক বিশাল মানুষ আমাদের রাষ্ট্রপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যথার্থ ও আক্ষরিক অর্থেই ছিলেন এক আলোর পথযাত্রী। তাঁর জয় হোক। জয়তু মুজিব।♦

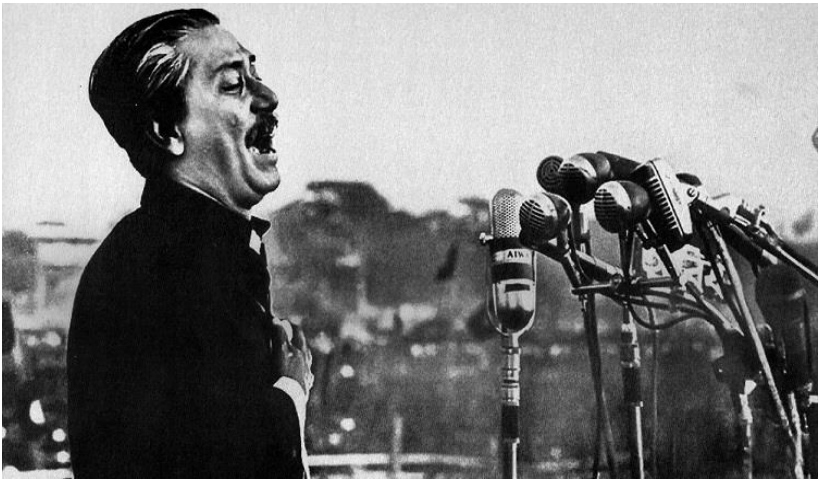

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংহত হওয়ার দিন

অধ্যাপক ড. নূরজাহান বেগম

আজ ১০ জানুয়ারি, ২০২১। আজ থেকে ৪৯ বছর আগের ঠিক এই দিনে ২৯০ দিন পাকিস্তানের কারাগারে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর প্রহর গুনতে গুনতে মুক্ত হয়ে বিজয়ীর বেশে স্বদেশে ফিরে আসেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে ২৫ মার্চ কালোরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদের পূর্ব পরিকল্পিত বাঙালি নিধনযজ্ঞের নীলনকশা 'অপারেশন সার্চলাইট' বাস্তবায়নে লাখ লাখ নিরীহ জনগণের ওপর আক্রমণ ও গণহত্যা চালায়। এ প্রেক্ষাপটে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে সর্বস্তরের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ লড়াই শুরু করার ডাক দেন।

স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়ার পরপরই দখলদার পাকিস্তানিরা বঙ্গবন্ধুকে তাঁর ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরের বাসা থেকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে আটকে রাখে। তাঁর অনুপস্থিতিতেই শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। আর অবরুদ্ধ বাংলাদেশে যখন পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ চলছে, ঠিক তখন

পশ্চিম পাকিস্তানে প্রহসনের বিচারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ফাঁসির আদেশ হয়। কারাগারের যে সেলে তাকে রাখা হয়েছিল, সেই সেলের পাশে কবর পর্যন্ত খোঁড়া হয়। পাকিস্তানিরা বন্দি অবস্থায় শেখ মুজিবকে হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু বিশ্ব জনমতের চাপে তারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতে পারেনি।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পরাজয় ও আত্মসমর্পণের ভেতর দিয়ে ১৬ ডিসেম্বর বাংলার মাটি শত্রুমুক্ত হয়েছিল। বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ নতুন পরিচয়ে পরিচিত হয়। এই পরিচয়ের যে আনন্দ তা ছিল বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে আপন ঠিকানায় ফেরার আনন্দ। কিন্তু জাতির অবিসংবাদিত নেতা পাকিস্তানি কারাগারে থাকায় দেশবাসী বিজয়ের আনন্দ উৎসবে তেমনভাবে শামিল হতে পারছিল না। নেতাকে গণহত্যাকারী রাষ্ট্র পাকিস্তান ফাঁসিতে ঝোলোবে কি না এই শঙ্কা থাকায় পুরো জাতি ও বিশ্ববাসী ছিল চরম উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগে। অবশেষে তিনি ফিরলেন। স্বাধীন বাংলাদেশে যেদিন বঙ্গবন্ধু অবতরণ করেছিলেন সেদিন এক অভূতপূর্ব দৃশ্য অবলোকন করেছিল বাঙালি জাতি তথা পুরো বিশ্ব। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু শ্লোগানে মুখর হয়েছিল বাংলার আকাশ বাতাস। চতুর্দিকে উল্লাস আর উৎফুল্ল জনতার সমুদ্র। বঙ্গবন্ধুর এই প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে আমাদের বিজয় পেল পরিপূর্ণতা। তাই ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি এক অবিস্মরণীয় দিন।

সেদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশের মাটি ছুঁয়ে শিশুর মতো আবেগে আকুল হলেন। আনন্দ-বেদনার অশ্রুধারা তার দু'চোখ বেয়ে নামলো। ওইদিন তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে খোলা গাড়িতে বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্স ময়দানে পৌঁছাতে সময় লেগেছিল আড়াই ঘণ্টা। আর রেসকোর্স ছিল লোকে লোকারণ্য। বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রিয় স্বদেশের মাটিতে পা রেখে বলেছিলেন, "আমি আজ বাংলার মানুষকে দেখলাম, বাংলার মাটিকে দেখলাম, বাংলার আকাশকে দেখলাম বাংলার আবহাওয়াকে অনুভব করলাম। বাংলাকে আমি সালাম জানাই আমার সোনার বাংলা তোমায় আমি বড়ো ভালোবাসি বোধ হয় তার জন্যই আমায় ডেকে নিয়ে এসেছে"। তিনি বলেছিলেন, "আমার বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে, আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে, আমার বাংলার মানুষ আজ মুক্ত হয়েছে"। "আমি কারাগারে বন্দী ছিলাম, ফাঁসি কাষ্ঠে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম কিন্তু আমি জানতাম আমার বাঙালিকে দাবায় রাখতে পারবে না"। "আমি জানতাম না আমি আপনাদের কাছে ফিরে আসবো আমি খালি একটা কথা বলেছিলাম, তোমরা যদি আমাকে মেরে ফেলে দাও কোন আপত্তি নাই মৃত্যুর পরে তোমরা আমার লাশটা আমার বাঙালির কাছে দিয়ে দিও এই একটা অনুরোধ তোমাদের কাছে"। তিনি আরও

বলেছিলেন, "আমার মৃত্যু আসে যদি আমি হাসতে হাসতে যাবো আমার বাঙালি জাতিকে অপমান করে যাবো না তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইবো না এবং যাবার সময় বলে যাবো জয় বাংলা, স্বাধীন বাংলা, বাঙ্গালি আমার জাতি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলার মাটি আমার স্থান"। "বাংলা আমার স্বাধীন, বাংলাদেশ আজ স্বাধীন"।

বাঙালির দীর্ঘ সংগ্রাম, ত্যাগ তীতিক্ষা, আন্দোলন ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার প্রশ্নে জাতি যখন কঠিন এক বাস্তবতার মুখোমুখি তখন জাতির পিতার প্রত্যাবর্তন অনিবার্য ছিল। তিনি না ফিরলে আজকের বাংলাদেশ যে মৌলিক কাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে তা সম্ভব হতো না। বঙ্গবন্ধু মাত্র ১ হাজার ৩১৪ দিন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলেন। এই অল্প সময়ে বাংলাদেশকে তিনি শক্ত ভিত্তি ও অনন্য উচ্চতায় দাঁড় করিয়ে গেছেন। ৮ জানুয়ারি ১৯৭২, রাওয়ালপিন্ডি থেকে লন্ডনে পদার্পণের পর থেকে ১০ জানুয়ারি ঢাকায় তার জনসভায় ভাষণদান পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান ছিল মাত্র ৫০ ঘণ্টার কিছু বেশি। কিন্তু এই-সময়টুকুর মধ্যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর কর্মকাণ্ড ছিল বিস্ময়কর।

তিনি ঢাকায় ফিরে ভারতকে প্রকাশ্যে ধন্যবাদ জানান এবং রেসকোর্সের ঐতিহাসিক সেই সভায় ঘোষণা করেছিলেন, "তাঁর (ইন্দিরা গান্ধী) সঙ্গে আমি দিল্লিতে পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করেছি। আমি যখনই চাইব ভারত বাংলাদেশ থেকে তার সৈন্যবাহিনী ফিরিয়ে নেবে।" তার দু-মাসের মধ্যেই ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্যদের ফিরিয়ে নেয়। এটি ছিল ভারতের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ার একটি অতি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। শুরু হয় যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের যাত্রা। অতি অল্প সময়ে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত স্কুল, কলেজ, রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট পুনর্নির্মাণ সংবিধান প্রণয়ন ও বৈশ্বিক সম্পর্ক স্থাপনে সফল হন। আর্থিক সংকটের মধ্যেও

বঙ্গবন্ধু সরকার পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সব শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে বই বিতরণ ও অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ঘোষণা করেন। ১ লাখ ৬৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি সরকারি হয়। শিক্ষকদের ৯ মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ ও ৪০০ হাই স্কুল এবং ৯০০ কলেজ ভবন পুনর্নির্মাণ করেন। তাঁর শাসনামলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৭ শতাংশেরও বেশি অর্জিত হয়েছিল। তিনি হাজার হাজার কোটি টাকার ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে নতুন করে উন্নয়ন স্তম্ভ দাঁড় করান।

বিশ্ব রাজনীতির নানা কূটকৌশল আর দেশীয় ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি শেষ হবার আগেই প্রায় ৫০টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে, এই সময়ে বাংলাদেশ ১২০টি দেশের স্বীকৃতি লাভ করেছে। সবই সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছিলেন বলেই।

আজ যখন বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের স্মৃতিবিজড়িত দিবসটি পালিত হচ্ছে, তখনো দেখা যাবে পরাজিত হায়েনার দোসরগণ বঙ্গবন্ধুর অবদানের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। তারা বঙ্গবন্ধুকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার বদলে অবমূল্যায়নের প্রচেষ্টা চালাবে। তাই ওই সব মীরজাফরদের প্রতি আমাদের তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভ। আমাদের যাপিত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে এসব পরাজিতদের চির নির্বাসন অতি জরুরি। সেদিন বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতি কতটা প্রয়োজন ছিল, তা এখনকার প্রজন্মের অনেককেই বোঝানো সম্ভব নয়। তখন অনেকেই মনে করছিলেন, 'আমরা সবাই রাজা'। একটি নৈরাজ্যের মতো অবস্থা ছিল ২৫টি দিন। তিনি না এলে মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র জমা দিতে চাইতেন না সহজে। ভারতীয় সৈন্যও হয়তো অত তাড়াতাড়ি ফিরে যেত না। বিশ্ব সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি পেতেও অনেক কাঠখড় পোহাতে হতো। তাঁর প্রত্যাবর্তনের দিন থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সংহত হয়।

তাই এই দিনে শপথ হোক– যারা বঙ্গবন্ধুর সময়কার 'চাটারদল'-এর মতো মুখে মুখে বঙ্গবন্ধুর গুনগান করবে কিন্তু অন্তরে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও নির্দেশনার বিপরীতে গণবিরোধী কাজ করবে, জাতি সেই সব বর্ণচোরা শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। তবেই দিনটি পালন আরো সার্থক হবে।♦

লেখক : সদস্য, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন।

১০ জানুয়ারি : বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস

খালেক বিন জয়েনউদদীন

১৯৭১ সালের ৩৬৫ দিনের প্রতিটি দিনই ছিল সংগ্রামী এবং উজ্জ্বল। এ বছরের ১৬ ডিসেম্বর আমরা মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেছিলাম। পরম কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা পেয়ে আমরা ভুলে গিয়েছিলাম স্বজন হারানোর বেদনা ও শোক। উল্লাস আর আনন্দে কেটে যাচ্ছিল আমাদের ষোলই ডিসেম্বরের দিনগুলো। কিন্তু পরম শান্তির মধ্যে আমাদের মুক্তির সাধ যেন পূর্ণ হচ্ছিল না। তখনও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী। কোন সংবাদই আমাদের কানে আসছিল না। একাত্তরে নভেম্বরে শোনা গিয়েছিল পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া তার ফাঁসির দণ্ডাদেশ ঘোষণা করেছে। এ ঘোষণা সম্পর্কে বিশ্ববাসী আর কোনো তথ্য সংগ্রহ করতে পারেনি। বাংলাদেশে তখন চলছিল মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়।

১৯৭১ সালের পঁচিশ মার্চ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ইয়াহিয়ার বৈঠক ভেঙে যায়। ইয়াহিয়া সার্চ নাইট অপারেশনের নির্দেশ দিয়ে পালিয়ে যান পাকিস্তানে। ভুট্টো যান ২৬ মার্চ। পঁচিশে মার্চের গণহত্যা ও নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর পাক আর্মির অকথ্য নির্যাতনের কথা গোটা বিশ্ববাসী জেনে যায়। ওইদিন দিবাগত রাতেই বঙ্গবন্ধুকে তার বাড়িতে বন্দী করা হয়। বন্দী হওয়ার আগে ঘোষিত 'বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা' ২৬ শে মার্চ দুপুরে, বিকালে এবং রাত ১০টায় চট্টগ্রাম বেতার ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণা করা হয়। এতে দেশবাসী বুঝতে পারে তিনি মুক্তই আছেন, বেঁচে আছেন। ২৭ মার্চ মেজর জিয়া যখন

বঙ্গবন্ধুর পক্ষে পুনরায় স্বাধীনতার ঘোষণা বাণী পাঠ করেন তখন আর বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সত্যিই বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হননি। পরের দিন তিনি আবার ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। তার নির্দেশেই সবকিছু চলছে। এ ঘোষণা স্বাধীনতাকামী মানুষের মনে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। সমগ্র দেশে তখন চলছিল পাকিস্তানি আর্মিদের প্রতিরোধ।

ইতোমধ্যে একটি মজার ঘটনা ঘটে গেল। মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করার লক্ষ্যে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ স্বাধীন বাংলা বেতারের ঘোষণা মিথ্যা বানানোর চেষ্টায় ১৯ এপ্রিল বঙ্গবন্ধুকে করাচীতে নেওয়ার পরের একখানা বন্দীদশার ছবি ছেপে দেয় স্থানীয় পত্রিকায়। দু'জন সৈন্য তাকে পাহারা দিচ্ছে, সোফায় বসে আছেন মহান নেতা–এই একটি ছবিই ২৫ শে মার্চ থেকে ৮ই ডিসেম্বর পর্যন্ত একাত্তরে আমাদের নজরে এসেছে। করাচীতে বঙ্গবন্ধুর সচিত্র ছবি প্রকাশের পর বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের দায়িত্ব কাঁধে নিতে হয় পাকিস্তান সরকারকে। এই বিষয়টি পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ আগে ভেবে দেখেনি। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যেও বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ একাকার হয়ে যায়। একটি ফুলের জন্য আমরা মরণপণ লড়াইয়ে তখন আত্মনিয়োগ করি।

১৯৭১ সালের ৮ই ডিসেম্বরের পূর্বে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের বিভিন্ন বন্দীখানায় নির্জন কারাভোগ করেছেন। এসময় তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য তারই জেলখানার পাশে কবর খোঁড়া হয়। জেনারেল ইয়াহিয়া খান তার ফাঁসির দণ্ডাদেশ ঘোষণা করেন। তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়, বিচারের প্রহসন অনুষ্ঠিত হয়। এসব ঘটনা একাত্তরের জানা যায়নি। একাত্তরে প্রকাশ্যে পাকিস্তানি শাসনে মুজিব শব্দটি একটিবারের জন্যও উচ্চারিত হয়নি। কেউ জানতে পারেনি পাকিস্তানি কারাগারে বঙ্গবন্ধু কিভাবে কাটিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ইয়াহিয়ার সাজানো মামলা শেষ হয় ৪ ডিসেম্বর। ৭ ডিসেম্বর তাকে নেওয়া হয় মিওয়ানওয়ালী জেলে। এখানে তাকে হত্যা করার চেষ্টা চালানো হয়। ১৪ ডিসেম্বর তাকে নেওয়া হয় ওই জেলের সুপারের বাড়িতে। এর পরের ঘটনা সম্পর্কে নিউইয়র্ক টাইমসে সেবার্গ লেখেন : সে তার বন্দীকে নিয়ে গেলো দু'মাইল দূরে তার নিজের বাড়িতে আর সেখানে রেখে দিল দু'দিনের জন্য। যুদ্ধ শেষ হয়ে আসছিল আর অফিসারদের মধ্যে যথেষ্ট সংশয় দেখা দিয়েছিল, আর ডিসেম্বর ১৪ তে সুপারিনটেনডেন্ট শেখ মুজিবকে বলল– খবর ফাস হয়ে গেছে, সুতরাং তাকে অন্য জায়গায় যেতে হবে।

এই কর্মকর্তা, যে ওই জেলার পুলিশেরও সুপারিনটেনডেন্ট ছিল, শেখ মুজিবকে নিয়ে গেলো বেশ কয়েক মাইল দূরে একটা খালি বাড়িতে। সেখানে তিনি

নয়দিন ছিলেন। যখন সৈন্যরা সুপারিনটেনডেন্টকে জিজ্ঞেস করলো তিনি কোথায়। সুপারিনটেনডেন্ট বলল, সে জানে না। অফিসার ইনচার্জ তখন তাকে বলল যে, শেখ মুজিবকে লুকিয়ে রাখার কিংবা ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, কেননা জুলফিকার আলী ভুট্টো ডিসেম্বর ১৯-এ কুখ্যাত জেনারেলদের কাছ থেকে ক্ষমতা নিয়ে নিয়েছেন এবং তিনি শুধু শেখ মুজিবকে দেখতে আর তার সঙ্গে কথা বলতে চান। শেখ মুজিব বেরিয়ে এলেন এবং তাকে তখনই বিমানে রাওয়ালপিণ্ডি নিয়ে যাওয়া হলো। যেখনে তাকে প্রেসিডেন্টের অতিথি ভবনে গৃহবন্দী করে রাখা হলো।

জনাব ভুট্টো সম্ভবত ভেবেছিলেন যে, যদি বাঙালিদের নেতাকে হত্যা করা হয়, তবে তারা প্রায় ৯০,০০,০০ আত্মসমর্পণ করা পাকিস্তানিকে হত্যা করবে আর যেহেতু এরা সবাই পাঞ্জাব আর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লোক, তাই তারা এই জন্য ভুট্টোকেই দায়ী করবে। আর তার সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে।

শেখ মুজিব বললেন, জনাব ভুট্টো তাকে ক্রমাগত চাপ দিচ্ছিলেন একটা সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য, যাতে যতই দুর্বল হোক পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে একটা সম্পর্ক যেন বজায় থাকে।

আমি তাকে বললাম, আমি একটা জিনিস আগে জানাতে চাই–আমি কি মুক্ত না বন্দী? শেখ মুজিব বললেন, 'যদি আমি মুক্ত হই, তাহলে যেতে দিন। আর যদি না হই, তাহলে কোনো কথা বলতেই আমি রাজি না।' 'আপনি মুক্ত'– 'তিনি ভুট্টোর কথা উদ্ধৃত করলেন– কিন্তু আমি আপনাকে যেতে দেওয়ার আগে কয়েকদিন সময় চাই।' মুক্তির প্রতিশ্রুত সত্ত্বেও শেখ মুজিব বললেন, তিনি কোনো ব্যাপারেই ভুট্টোর সঙ্গে আলোচনা করেননি।

আরেক মূহূর্তে, যখন জনাব ভুট্টো বলেছিলেন যে দুই অংশ এখনও আইন আর ঐতিহ্য দিয়ে যুক্ত, তখন শেখ মুজিব তাকে মনে করিয়ে দিলেন যে গত জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামীলীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে আর এই ফলাফলকে কখনোই শ্রদ্ধা করা হয়নি–

জানুয়ারি ৭-এ প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবের সঙ্গে তৃতীয় আর শেষবারের মতো দেখা করতে গেলেন। বাঙালি নেতা তাকে বললেন, 'আপনি অবশ্যই আমাকে আজকে রাতে মুক্তি দেবেন। আর দেরি না করার কোনো সময় নেই। হয় আমাকে মুক্ত করুন, নয় হত্যা করুন।'

ভুট্টো উত্তর দিয়েছেন যে, এত স্বল্প সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়, কিন্তু পরে তাকে লন্ডন পাঠিয়ে দিতে রাজি হলেন। শেখ মুজিব বললেন, ভুট্টো তাকে বিদায় জানানোর সময় বলেছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে রাজনৈতিক

সম্পর্কের কথা বিবেচনা করতে। আটই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন এলেন। লন্ডন থেকে এক রাত থেকে সোজা দিল্লী পালাম বিমানবন্দরে নামলেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দরা গান্ধী তাকে অভ্যর্থনা জানালেন। অভ্যর্থনার জবাবে সেদিন বঙ্গবন্ধুকে বলেছেন :

'আমার জন্য এটা পরম সন্তোষের মুহূর্ত। বাংলাদেশে যাবার পথে আমি আপনাদের মহতী দেশের ঐতিহাসিক রাজধানীতে যাত্রা বিরতি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এ কারণে যে, আমাদের জনগণের সবচেয়ে বড় বন্ধু ভারতের জনগণ এবং আপনাদের মহীয়সী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী–যিনি কেবল মানুষের নয় মানবতারও নেতা। তার নেতৃত্বাধীন ভারতে সরকারের কাছে এর মাধ্যমে আমি আমার ন্যূনতম ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারব। এ অভিযাত্রা সমাপ্ত করতে আপনারা সবাই নিরলস পরিশ্রম করেছেন এবং বীরোচিত ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

এ অভিযাত্রা অন্ধকার থেকে আলোয়, বন্দীদশা থেকে স্বাধীনতায়, নিরাশা থেকে আশার অভিযাত্রা। অবশেষে আমি নয় মাস পর আমার স্বপ্নের দেশ–সোনার বাংলায় ফিরে যাচ্ছি। এ নয় মাসে আমার দেশের মানুষ শতাব্দীর পথ পাড়ি দিয়েছে। আমাকে যখন আমার মানুষদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, তখন তারা কেঁদেছিল, আমাকে যখন বন্দী করে রাখা হয়েছে, তখন তারা যুদ্ধ করেছিল আর আজ যখন আমি তাদের কাছে ফিরে যাচ্ছি, তখন তারা বিজয়ী। আমি ফিরে যাচ্ছি তাদের নিযুত বিজয়ী হাসির রৌদ্র করে। আমাদের

বিজয়কে শান্তি অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করার যে বিরাট কাজ এখন আমাদের সামনে তাতে যোগ দেওয়ার জন্য আমি ফিরে যাচ্ছি– আমার হৃদয় কারো জন্য কোনো বিদ্বেষ নিয়ে নয়, বরং এ পরিতৃপ্তি নিয়ে যে, অবশেষে মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের, ভীরুতার বিরুদ্ধে সাহসিকতার অবিচারের বিরুদ্ধে সুবিচারের এবং অশুভের বিরুদ্ধে শুভের বিজয় হয়েছে। জয় বাংলা, জয় হিন্দ।

বঙ্গবন্ধু মুক্তি পাবার সংবাদ শুনে গোটা বাংলাদেশ আবার জেগে উঠলো। স্বার্থক হলো ১৬ ডিসেম্বরের মহান বিজয়। কখনো প্রিয় মানুষটি দেশে ফিরবেন এ আগ্রহ যেন ক্রমশ সময়কে অধীর করে তুলছিল। গ্রাম থেকে ছুটে আসলে লক্ষ লক্ষ মানুষ। ১০ই জানুয়ারি ঢাকা জনসমুদ্রে মিলে যাবেন, যারা তাকে ভালোবাসে তাদের কাছেই ফিরে যাবেন। সেই চির পরিচিত স্থান রেসকোর্স। অবশেষে তিনি এলেন, তেজগাঁও বিমান বন্দরে বিমান থেকে নেমে মুক্ত-স্বদেশের একমুঠো মাটি হাতে নিলেন। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রমুখকে জড়িয়ে ধরে বাচ্চা ছেলের মতো অঝোরে কেঁদে ফেললেন। সে এক ঐতিহাসিক দৃশ্য। না, তিনি ফিরে গেলেন না প্রিয়তম স্ত্রী ও সন্তানদের কাছে। তিনি চলে গেলেন নৌকা শোভিত জনতার মঞ্চে। হাত উঠিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর আবার কান্না। বঙ্গোপসাগরের সমস্ত জল চোখে নিয়ে তিনি বললেন–

আজকের এই শুভলগ্নে আমি সর্বপ্রথম আমার দেশের সংগ্রামী কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সেই বীর শহীদদের কথা স্মরণ করছি, যারা গত নয়মাসের স্বাধীনতা সংগ্রামে বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর হাতে প্রাণ দিয়েছেন। আমি তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে। আমার সোনার বাংলা আজ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার উদ্দেশ্যে আমি সালাম জানাই।

ইয়াহিয়া খাঁর কারাগারে আমি প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেছি। মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুতও ছিলাম। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ যে মুক্ত হবে, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তবে, এই মুক্তির জন্য যে মূল্য দিতে হলো, তা কল্পনারও অতীত। আমার বিশ্বাস, পৃথিবীর ইতিহাসে কোন দেশের মুক্তি সংগ্রামে এত লোকের প্রাণহানির নজির নেই। আমার দেশের নিরীহ মানুষদের হত্যা করে তারা কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছে, আমাদের মা- বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করে তারা জঘন্য বর্বতার প্রমাণ দিয়েছে, সোনার বাংলা অসংখ্য গ্রাম পুড়িয়ে তারা ছারখার করে দিয়েছে। পাকিস্তানের কারাগারে বন্দীদশায় থেকে আমি জানতাম, তারা আমাকে হত্যা করবে। কিন্তু তাদের কাছে আমার অনুরোধ ছিল, আমার লাশটা তারা যেন বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়, বাংলার পবিত্র মাটি যেন আমি পাই।

আমি স্থির প্রতিজ্ঞ ছিলাম, তাদের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে বাংলার মানুষদের মাথা নীচু করব না।

আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এবং ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার জনসাধারণের প্রতি আমাদের এই মুক্তি সংগ্রামে সমর্থন দানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমাদের দেশের প্রায় এক কোটি মানুষ ঘর-বাড়ি ছেড়ে মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। ভারত সরকার ও তার জনসাধারণ নিজেদের অনেক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এই ছিন্নমূল মানুষদের দীর্ঘ নয় মাস ধরে আশ্রয় দিয়েছে, খাদ্য দিয়েছে। এ জন্য আমি ভারত সরকার ও ভারতের জনসাধারণকে আমার দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে অন্তরের অন্তস্থল হতে ধন্যবাদ জানাই।

গত ৭ই মার্চ এই ঘোড়দৌড় ময়দানে আমি আপনাদের বলেছিলাম, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলুন; এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আপনারা বাংলাদেশের মানুষ সেই স্বাধীনতা এনেছেন। আজ আবার বলছি, আপনারা সবাই একতা বজায় রাখুন। ষড়যন্ত্র এখনও শেষ হয়নি। আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। একজন বাঙালিও প্রাণ থাকতে এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেবে না। বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবেই টিকে থাকবে। বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে এমন কোনো শক্তি নেই।

আমাদের লোকদের হত্যা করতে যারা সাহায্য করেছে তাদের ক্ষমা করা হবে না। সঠিক বিচারের মাধ্যমে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে।

আপনারা জানেন, আমার বিরুদ্ধে মামলা দাঁড় করানো হয়েছিল এবং অনেকেই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে। আমি তাদের জানি আপনারা আরও জানেন যে, আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। আমার জেলের পাশে আমার জন্য কবরও খোঁড়া হয়েছিল। আমি মুসলমান। আমি জানি, মুসলমান মাত্র একবারই মরে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাদের নিকট নতি স্বীকার করব না। ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। জয় বাংলা।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত্রে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে বন্দী হওয়ার পূর্বে আমার সহকর্মীরা আমাকে চলে যেতে অনুরোধ করেন। আমি তখন তাদের বলেছিলাম বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে বিপদের মুখে রেখে আমি যাব না। মরতে হলে আমি এখানেই মরব। বাংলা আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। তাজউদ্দিন এব আমার অন্যান্য সহকর্মীরা তখন কাঁদতে শুরু করেন।

আমার পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইয়েরা, আপনাদের প্রতি আমার কোনো বিদ্বেষ নেই। আমি চাই, আপনারা সুখে থাকুন। আপনাদের সেনাবাহিনী আমাদের অসংখ্য লোককে হত্যা করেছে, আমাদের মা-বোনদের মর্যাদাহানি করেছে, আমাদের গ্রামগুলো বিধ্বস্ত করেছে। তবুও আপনাদের প্রতি আমার কোনো আক্রোশ নেই। আপনারা স্বাধীন থাকুন, আমরাও স্বাধীন থাকি। বিশ্বের অন্য যেকোনো দেশের সাথেও আমাদের শুধুমাত্র সেই ধরনের বন্ধুত্বই হতে পারে। কিন্তু যারা অন্যায়ভাবে আমাদের মানুষদের মেরেছে, তাদের অবশ্যই বিচার হবে। বাংলাদেশে এমন পরিবার খুব কমই আছে, যে পরিবারের লোক মারা যাননি।

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। ইন্দোনেশিয়ার পরেই এর স্থান। মুসলিম জনসংখ্যার দিক দিয়ে ভারতের স্থান তৃতীয় ও পাকিস্তানের স্থান চতুর্থ। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী ইসলামের নামে এদেশের মুসলমানদের হত্যা করেছে, আমাদের নারীদের বেইজ্জত করেছে। ইসলামের অবমাননা আমি চাই না। আমি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতে চাই যে, আমাদের দেশ হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক দেশ। এদেশের কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।

আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে শ্রদ্ধা করি। তিনি দীর্ঘকাল যাবত রাজনীতি করছেন। তিনি শুধু ভারতের মহান সন্তান পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কন্যাই নন, মতিলাল নেহরুর নাতনীও। তার সাথে আমি দিল্লীতে পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করেছি। আমি যখনই চাইব, ভারত বাংলাদেশ থেকে তার সৈন্যবাহিনী তখনই ফিরিয়ে নেবে। ইতোমধ্যেই ভারতীয় সৈন্যরা একটা বিরাট অংশ বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

আমার দেশের জনসাধারণের জন্য শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী যা করেছেন, তার জন্য আমি তাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমার মুক্তির জন্য বিশ্বের সকল দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন, তারা যেন আমাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য ইয়াহিয়া খানকে অনুরোধ জানান। আমি তার নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব। প্রায় এক কোটি লোক যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ভয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল এবং বাকি যারা দেশে রয়ে গিয়েছিল তারা সবাই দুঃখকষ্ট ভোগ করেছে। আমাদের এই মুক্তি সংগ্রামে যারা রক্ত দিয়েছে, সেই বীর মুক্তি বাহিনী, ছাত্র-কৃষক, শ্রমিক সমাজ, বাংলার হিন্দু-মুসলমান, ই.পি.আর পুলিশ, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও অন্য আর সবাইকে আমার

সালাম জানাই। আমার সহকর্মীরা, আপনারা মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার ব্যাপারে যে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন, তার জন্য আমি আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনাদের মুজিব ভাই আহ্বান জানিয়েছেন আর সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আপনারা যুদ্ধ করেছেন, তার নির্দেশ মেনে চলেছেন এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছেন আমার জীবনের একমাত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ যেন তাদের খাদ্য পায়, আশ্রয় পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।

পাকিস্তানী কারাগার থেকে আমি যখন মুক্ত হই, তখন জনাব ভুট্টো আমাকে অনুরোধ করেছিলেন–সম্ভব হলে আমি যেন দু'দেশের মধ্যে একটা শিথিল সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করি। আমি তাকে বলেছিলাম, আমার জনসাধারণের কাছে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত আমি আপনাকে এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারি না। এখন আমি বলতে চাই, জনাব ভুট্টো সাহেব, আপনারা শান্তিতে থাকুন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায়, তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য মুজিব সর্বপ্রথম তার প্রাণ দেবে। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বাংলাদেশে যে নির্বিচার গণহত্যা করেছে তার অনুসন্ধান ও ব্যাপকতা নির্ধারণের জন্য আমি জাতিসংঘের নিকট একটা আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠনের আবেদন জানাচ্ছি।

আমি বিশ্বের সকল দেশকে অনুরোধ জানাই, আপনারা অবিলম্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন এবং সত্বর বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্য করে নেওয়ার জন্য সাহায্য করুন।

স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে বঙ্গবন্ধু বীরোচিত প্রত্যাবর্তনের সেই স্মৃতি কোনো বাঙালিই ভুলতে পারবেন না। লক্ষ কোটি জনতার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর সেই উজ্জ্বল উপস্থিতি আজও আমাদের উজ্জীবিত করে তোলে, অনুভূতিতে প্রাণ ভরে সাড়া দেয়। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় আমরা বলতে পারি–

ভেঙেছো দুয়ার
এসেছো
তোমারই হউক জয়।♦

তথ্যসূত্র :

১। বুলেটিন ১৬ সংখ্যা-১০ জানুয়ারি ১৯৯৬।
প্রকাশনা : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।
২। মিওয়ানওয়ালী জেলে বঙ্গবন্ধুর কবর খোঁড়া হয়েছিল : আমিনুল হক বাদশা।
৩। বঙ্গবন্ধু হত্যার দলিল : সম্পাদনা অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, সুচয়ন প্রকাশনা, ঢাকা।
৪। নিউইয়র্ক টাইম : প্রতিবেদক : সিডনী এইচ সেনবার্গ।

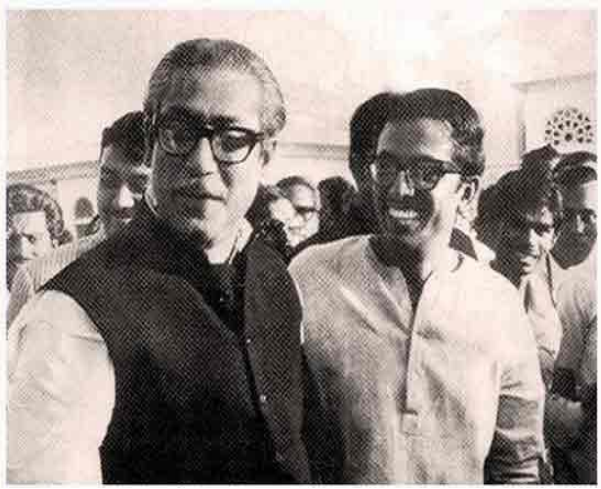

বঙ্গবন্ধু ও কামাল লোহানী

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ধারা বর্ণনা

কামাল লোহানী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পাকিস্তানি বন্দিশালা থেকে ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ছিল রূপকথার মহানায়কের প্রত্যাবর্তন। বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বেতার-এর ধারাবিবরণী প্রদানকারীদের একজন ছিলেন দেশের অন্যতম প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী সংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী। বর্তমানে প্রয়াত কামাল লোহানী সেই ঐতিহাসিক ঘটনার স্মরণ করে ১০ জানুয়ারি ২০২০ সালে দৈনিক সংবাদে একটি স্মৃতিচারণমূলক লেখা লিখেন। অগ্রপথিক-এর পাঠকদের জন্য বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের এই মাসে লেখাটি পুনর্মুদ্রণ করলাম–

১০ জানুয়ারি ১৯৭২। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফিরে আসবেন তার প্রিয় মাতৃভূমি মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে। স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রের প্রতিটি পর্যায়ে ব্যাপক প্রস্তুতি আর আবেগঘন পরিবেশ, বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুকে সুস্বাগতম জানাবার উদ্দেশে। মরণজয়ী এই বীর দস্যুদানবের দেশ পাকিস্তান থেকে মুক্ত স্বদেশে ফিরবেন, অশেষ আনন্দের বাঁধভাঙা বন্যা সবার মাঝে। মুক্তিযুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধ হাঁক দিয়ে যে মানুষটি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে বন্দী হয়ে কারাবাস করেছেন ন'মাস, তিনি আজ আসবেন তার ভালোবাসার মানুষগুলোর কাছে। কী আনন্দ চতুর্দিকে।

আমি তখন বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্রের দায়িত্বে নিয়োজিত। সবার মাধ্যমে সবার সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলাম এই মহান পুরুষের মুক্ত স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকে বেতারের মাধ্যমে সরাসরি ধারা বিবরণী দিয়ে বাংলাদেশ তথা বিশ্ববাসীর কাছে তার শুভাগমন তুলে ধরতে। ঠিক হলো, তেজগাঁও বিমানবন্দরের একতলা ভবনের ছাদ থেকে বাংলাদেশ বেতারের ধারাবিবরণী শুরু হবে এবং কারওয়ানবাজার হয়ে শাহবাগ ব্রডকাস্টিং হাউজ পেরিয়ে রেসকোর্স ময়দানে এসে এই বিবরণী শেষ হবে। এই চারটি পয়েন্টে আমরা দু'জন করে অর্থাৎ তেজগাঁয় আমি নিজে ও আমার সহযোগী সহকারী পরিচালক আশফাকুর রহমান খান, কারওয়ানবাজার পয়েন্টে টি এইচ শিকদার ও শহিদুল ইসলাম, ব্রডকাস্টিং হাউসে মুস্তফা আনোয়ার ও আশরাফুল আলম এবং রেসকোর্স ময়দানে নির্মিত মঞ্চে আমি এবং আশফাক তেজগাঁও শেষ করে এখানে আসব। সেইমতো সবাইকে দায়িত্ব বেটে দেয়া হলো। ঢাকার বিমানবন্দর তখন তেজগাঁয় ছিল। এই চলতি বিবরণী প্রচারের জন্যে দিল্লি থেকে আকাশবাণীর প্রতিনিধি হিসেবে এলেন ইংরেজি সংবাদপাঠক, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ধারাভাষ্যকার সুরজিৎ সেন এবং হিন্দির জন্যে এলেন কে কে নায়ার। আর কলকাতা থেকে এলেন মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে সুপরিচিত জনপ্রিয় সংবাদপাঠক দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ওরাও সামিল হবেন আমাদের এই ধারাভাষ্যে, জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে। ঐতিহাসিক মুহূর্তের জন্য আমরা তেজগাঁও বিমানবন্দরের একতলার ছাদে অপেক্ষমাণ পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লন্ডন থেকে দিল্লি হয়ে সরাসরি ঢাকা আসবেন, অধীর আগ্রহে প্রতিক্ষা সেই জন্য। অকস্মাৎ পশ্চিম আকাশে দৃশ্যমান হলো সেই শ্বেতহংসটি যে বাংলার মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে ঢাকা পৌঁছে। বিস্ময়ে হতবাক দূর পশ্চিম আকাশের ওই একখণ্ড উড়োজাহাজকে দেখতে পেয়ে যেন অগণিত মানুষের ভিড় জ্বলে উঠল প্রবল আবেগে। চতুর্দিক মুখোরিত হয়ে উঠল 'তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব শেখ মুজিব', 'জয় বাংলা' এই ধ্বনিতে। আকাশ যেন কেঁপে উঠছিল বিপুল মানুষের সমুদ্র গর্জনে। তাকিয়ে দেখলাম তেজগাঁও থেকে যে রাস্তা সোজা গেছে শাহবাগের দিকে, সে রাস্তার কালো পিচ দেখা যাচ্ছে না, শুধু চোখে পড়ছে মানুষ আর মানুষ। বিপুল জনতরঙ্গ উত্তাল যেন স্লোগানে মুখর এক প্রবল আহ্লাদে। প্রাণপ্রিয় নেতা তাদের ফিরছেন আজ এখানে।

আমরা যারা এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে বেতার ভাষ্য দেয়ার জন্য তেজগাঁয় উপস্থিত তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই দেবদুলাল আমাদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় ছিলেন। আকাশবাণী কলকাতার সংবাদ পরিক্রমার লেখক প্রণবেশ সেন

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় নিয়মিতভাবে লিখতেন আর তাই আবেগময় দানাদার কণ্ঠে পাঠ করতেন দেবদুলাল। সংবাদ পরিক্রমার লেখক প্রণবেশ আমাদের ছোটবেলার বন্ধু এবং কলকাতা আকাশবাণীর প্রতিনিধি। তার বাবা ছিলেন পাবনার যশস্বী আইনজীবী কমলেশ সেন। প্রণবেশের বন্ধু দেবদুলাল যে সংবাদ পরিক্রমা পাঠ করতেন প্রতিদিন তাতে ছিল বাংলার মানুষের অকুতোভয় যুদ্ধযাত্রা এবং অমিততেজ লড়াইয়ের কাহিনী। কিংবা থাকতো শত্রুর পরাজয়ে বিজয়ী বাঙালির আনন্দ উল্লাস। কি আবেগ নিয়েই না ফুটিয়ে তুলতেন প্রণবেশ সেন শরণার্থীদের দুঃসহ যন্ত্রণার কথা। আজ সেই মানুষটিকে সঙ্গে নিয়ে আমি আর আশফাক, সুরজিৎ আর নায়ার আমাদের সব মানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন কাভার করতে এসেছি।

যে ব্রিটিশদের কাছ থেকে এককালে আমরা আমাদের তথাকথিত স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম, সেই ব্রিটিশ শ্বেতহংসে আরোহণ করে এসে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার ক্ষত-বিক্ষত তেজগাঁও বিমানবন্দরে নামলেন আমাদের জাতির সেই মহান পুরুষ, যাকে একনজর দেখবার জন্য অযুত মানুষের ভিড়। ব্রিটিশ বিমানবাহিনীর উড়োজাহাজটি এসে নামলো তেজগাঁও বিমানবন্দরে। মাটি স্পর্শ করতেই রানওয়েতে অপেক্ষমাণ জনতার মধ্য থেকে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ছুটে গেলেন ফুলের মালা হাতে, বিমানের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলেন, দোরগোড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মালা পরিয়ে বুকে মাথা দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠলেন তাজউদ্দিন। এরমধ্যে কীর্তিমান সন্তান সেই মহান পুরুষ বঙ্গবন্ধু তাকিয়ে দেখলেন রানওয়েতে একটি হুইলচেয়ারে প্রতীক্ষা করছেন তার বিজয়ী সন্তানকে বুকে জড়িয়ে আদর করতে, শেখ লুতফর রহমান, বঙ্গবন্ধুর অশীতিপর বাবা।

তিনি ছুটে গেলেন, মাটিতে হাঁটু গেড়ে বাবার বুকে সন্তানের পিতৃস্নেহ গ্রহণের সেকি অপরূপ দৃশ্য, বর্ণনা দিয়ে বোঝানো যাবে না। আমরাতো বাংলাদেশ বেতার আর আকাশবাণীতে পাঁচজন ধারাভাষ্যকার বিপুল উৎসাহে বাংলা, ইংরেজি এবং হিন্দিতে ধারাবিবরণী দিয়ে চলেছি। প্রতিটি মুহূর্ত চাইছি মানুষের কাছে যেন আমাদের কথায় দৃশ্যমান হয়, প্রাণান্ত সেই চেষ্টা। জানিনা কতখানি স্বার্থক হয়েছিল সেদিনের আবেগ উচ্ছল বেতার ধারাভাষ্য। ওদিকে আবেগময় মুহূর্ত শেষ হয়ে গেলে মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জানানো হলো 'গার্ড অব অনার'। এবার তার তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে গন্তব্যের পথে রওনা দেয়া। ভারতীয় নিরাপত্তাবাহিনী তখনও দায়িত্বে ছিলেন আর তাই একটি মোটরকারে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনার কথা জানালেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে অগণিত মানুষের ভিড়ে 'পালিয়ে যাবার মতো' কোন চতুর্দিক ঢাকা গাড়িতে যেতে রাজি হলেন না। নিরাপত্তা বাহিনী উপর্যুপুরি যুক্তি দেখিয়ে তার যাত্রাপথকে সুগম করতে চাইলেন, কিন্তু বঙ্গবন্ধু নাছোড়বান্দা। তিনি একটি খোলা ট্রাকে নেতা পরিবেষ্ঠিত হয়ে যেতে চান রেসকোর্স ময়দানে আর পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বিপুল জনসমুদ্রকে তিনি অভিবাদন জানাতে চান ন'মাসের বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের জন্য।

অবশেষে একেবারে খোলা ট্রাকে খোন্দকার মোশতাক, তাজউদ্দিন আহমদ, যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মণি, আবদুর রাজ্জাক, ছাত্রনেতা নূরে আলম সিদ্দিকী,

তোফায়েল আহম্মেদ, আবদুল কুদ্দুস মাখন এবং শাজাহান সিরাজ দ্বারা পরিবেষ্ঠিত হয়ে যাত্রা শুরু করলেন। এদিকে আমাদের বেতার ভাষ্য দেয়ার জন্য রেসকোর্স ময়দানের মঞ্চে উপস্থিত হবার কথা ছিল যে পাঁচজনের সুরজিত সেন, কে কে নায়ার, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, আশফাকুর রহমান খান ও আমার সে চিন্তায় পড়ল ছেদ। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম এই বিপুল জনসমুদ্রে গাড়িতো দূরের কথা আমরা পায়ে হেঁটেও রেসকোর্স পৌঁছুতে পারব না। অবশেষে বেকুবের মতো হা করে ওই ছাদেই দাঁড়িয়ে রইলাম! কিন্তু আমি যোগাযোগ করলাম অন্য পয়েন্টগুলো যেন ঠিকমতো কাভার হয় এবং শেষ পর্যন্ত কেউ যেন রেসকোর্স ময়দানের মঞ্চে গিয়ে ধারাবিবরণী প্রচার করেন। সে কাজটি করেছিলেন আশরাফুল আলম, শাহবাগ বেতার ভবন থেকে রেসকোর্সে গিয়েছিলেন পায়ে হেঁটে। বিবরণী প্রচারের ব্যবস্থা মঞ্চেই ছিল সুতরাং সে ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে তিনি যতোটা সম্ভব ধারাভাষ্য প্রচার করেছিলেন।

ওই যে বলছিলাম আমরা অবাক বিস্ময়ে তার যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, তখন চোখে পড়ছিল রাস্তায়তো বটেই রাস্তার পাশে, দালানগুলোতেও এমনকি গাছের ডালে ডালে পর্যন্ত ওঠে বসেছিলেন অগণিত মানুষ তাদেরই চেনা মুখ অতিপ্রিয় বঙ্গবন্ধুকে দেখার জন্য। যেখান দিয়েই খোলা ট্রাকটি এগিয়ে যাচ্ছিল সেখানকার উপস্থিত জনতা বঙ্গবন্ধুর নামে স্লোগান দিয়ে গলা ফাটিয়ে উল্লাস প্রকাশ করছিলেন, দিচ্ছিলেন 'জয় বাংলা' ধ্বনি। তাকিয়ে দেখছিলাম বিপুল জনসমুদ্রে ধীর গতিতে ভেসে চলেছে একটি খোলা ট্রাক মহানায়ককে বহন করে। এ দৃশ্য শুধু দেখা যায় বর্ণনা করা যায় না। তবু বলি যেন একটি ছোট্ট নৌকো যেন জনতার সমুদ্রে ভেসে চলেছিল। প্রতিটি গাছের ডালে যেমন মানুষ ঝুলছে তেমনি দেখেছি সেদিন বাড়ির বারান্দায় কিংবা বেলকনিতে কিংবা খোলা দরজা, জানালায় দাঁড়িয়ে আছেন গৃহবধূরা, মনে তাদের উল্লাস মহান পুরুষের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে আর স্বাধীন বাংলাদেশের বিপুল গর্জনে।

এইতো মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্রের স্লোগানে লড়েছিল মুক্তিযুদ্ধ ন'মাস চূড়ান্ত সশস্ত্র লড়াইয়ে। নির্দেশ দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ ১৯৭১ তার বজ্রকণ্ঠের অমোঘ বাণীতে, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। সেই মহানায়কের প্রত্যাবর্তনে একি উল্লাস! উদ্বেলিত মানুষের আহ্লাদিত চিত্তের তাই পরম প্রকাশ দেখেছিলাম ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ মহান নেতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে।♦

বঙ্গবন্ধু ও আবু সাঈদ চৌধুরী

বঙ্গবন্ধুর মুক্তিতে ইন্দিরা, আবু সাঈদ চৌধুরীসহ বিশ্ব নেতাদের অবদান

শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক

৫ অগাস্ট ১৯৭১ ইয়াহিয়া ঘোষণা করে যে রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানে বিচার করা হবে। ইয়াহিয়া আরও বলেছিল, বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি নাগরিক বিধায় তার বিচার পাকিস্তানেই হবে।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পাকিস্তানি পরিকল্পনা জানার পরপরই যারা তার মুক্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করেছিলেন তাদের মধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং মুজিবনগরভিত্তিক বাংলাদেশ সরকারের নিযুক্ত বিদেশ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে ইয়াহিয়ার ঘোষণার বহু আগেই জুলাই মাসের শুরুতে হেনরি কিসিঞ্জার দিল্লি এলে ইন্দিরা গান্ধী তাকে পরিষ্কার বলে দেন শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি এবং

তার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পাকিস্তানি জান্তার ওপর চাপ প্রয়োগ এবং পাকিস্তানে সামরিক সাহায্য বন্ধ করতে হবে।

তাছাড়া ইন্দিরা গান্ধী জুন মাসেই তার শিল্পমন্ত্রী মইনুল হক চৌধুরীকে অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, সুইডেন, হল্যান্ড এবং ইতালির সরকার প্রধান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। মন্ত্রী মইনুল হক চৌধুরী ওইসব দেশের শীর্ষ নেতাদের সাথে আলাপকালে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির যে কোনো বিকল্প নেই সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেন। ইন্দিরা তার অন্য ৩ জন মন্ত্রীকেও বিভিন্ন দেশে একই উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন একই সময়।

তবে ইন্দিরার যে পন্থা বিশ্ব নেতাদেরকে পাকিস্তানের উপর চাপ প্রয়োগে সর্বাধিক উদ্বুদ্ধ করেছিল সেটি ছিল তার ১৯৭১ সালের ১০ অগাস্ট বিশ্বের সকল সরকার প্রধানকে লেখা চিঠি। সে চিঠিতে ইন্দিরা বঙ্গবন্ধুর প্রহসনের বিচার বন্ধের জন্য ইয়াহিয়ার ওপর বিশ্ব নেতাদের চাপ দেওয়ার অনুরোধ করে লেখেন, 'ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন সামরিক কায়দায় বিচার করতে যাচ্ছে শুনে ভারতের সরকার, জনগণ, সংসদ এবং সংবাদকর্মীরা গভীরভাবে মর্মাহত। আমাদের ভয় এই তথাকথিত বিচারের নামে তারা শেখ মুজিবকে হত্যাচেষ্টার পরিকল্পনা করছে। এটি পূর্ব বাংলার পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটাবে এবং এর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ভারতেও ছড়িয়ে পড়বে, কেননা ভারতের জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলো এটিকে সহজভাবে নেবে না। আমরা এ খবরে চরম উৎকণ্ঠিত। আপনাদের কাছে আমাদের আবেদন আপনারা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে এই কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য তার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন, যা এই অঞ্চলের শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য অপরিহার্য।' *(সূত্র ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ১০ অগাস্ট, ১৯৭১)*

ইন্দিরা গান্ধী ৭১-এর সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলাদেশ পরিস্থিতি এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য জোরালো দাবি উত্থাপনের জন্য তার অতি পারদর্শী এবং সুবক্তা পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিংকে পাঠিয়েছিলেন। বাংলাদেশে পাকিস্তান অমানবিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে অবশ্যই মুক্তি দিতে হবে ও তার বিচারের চিন্তাকে প্রহসন বলে ২৭ সেপ্টেম্বর শরণ সিং কঠোর ভাষায় বক্তব্য দেওয়া শুরু করলে পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত আগাশাহী বৈধতার প্রশ্ন তুলে বলেন, 'জাতিসংঘে কোনো দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে আলোচনা হতে পারে না।'

কিন্তু সৌদি দূত দাঁড়িয়ে বলেন, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বাধা দেওয়া যায় না; তবে তার বক্তৃতায় যে অংশে পূর্ব পাকিস্তানের উল্লেখ আছে সে অংশ বাদ দিলে কোনো রূপ আপত্তির কারণ থাকবে না। তখন সে বছর সাধারণ পরিষদের

সভাপতি ইন্দোনেশিয়ার আদম মালিক শরণ সিংকে পূর্ব পাকিস্তান অংশ বাদ দিতে রাজি কিনা জিজ্ঞেস করলে শরণ সিং বলেন, 'পাকিস্তানের সীমাহীন নিপীড়ন ও নির্যাতনের ফলে বিষয়টি আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে, এটি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বললে আন্তর্জাতিক আইনকে উপহাস করা হবে।'

শরণ সিং এ সমস্যার সমাধানকল্পে অবিলম্বে শেখ মুজিবের আশু মুক্তির দাবি জানান। শরণ সিং বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের যেকোনো সমস্যার সমাধান করতে হলেই সেটিকে শেখ মুজিব এবং অন্যান্য নির্বাচিত সদস্যদের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে হবে। শরণ সিংয়ের জোরালো ভাষণে অভিভূত হয়ে মুজিবনগরভিত্তিক বাংলাদেশ সরকারের নিয়োগপ্রাপ্ত প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, যিনি তখন তার ১৬ সদস্যের দল নিয়ে জাতিসংঘের দর্শকদের গ্যালারিতে উপস্থিত ছিলেন, সৈয়দ আব্দুস সুলতান এবং এ এইচ মাহমুদ আলীকে নিয়ে অধিবেশন শেষে শরণ সিংয়ের হোটেলে গিয়ে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আসেন'। *(সূত্র: বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী প্রণীত 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো', পৃষ্ঠা-১৭৭)*

অগাস্ট মাসে ভারতের এক সময়ের প্রতিরক্ষামন্ত্রী, সেই সময়ের সংসদ সদস্য কৃষ্ণ মেনন লন্ডনে তার বন্ধু বৎসল প্রভাবশালী নেতাদের নিকট বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষার আবেদন নিয়ে যুক্তরাজ্যে গমন করেন। সাথে ছিলেন সুপরিচিত সাংবাদিক তারাপদ বসু। কৃষ্ণ মেনন সেই উদ্দেশ্যে লন্ডনে ব্যস্ত সময় কাটান *(বিচারপতি চৌধুরীর উল্লিখিত বই, পৃষ্ঠ ৯৬)*

২৭ নভেম্বর ইন্দিরা গান্ধী ইয়াহিয়াকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবি জানিয়ে লিখেছিলেন, 'বাংলাদেশে রাজনৈতিক সমাধানে আসুন এবং অবিলম্বে মুজিবকে মুক্তি দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নিন।' ইন্দিরা গান্ধী তার এ দাবি ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী অটলের মাধ্যমে প্রেরণ করেন। *(সূত্র: দৈনিক আনন্দবাজার, ২৮ নভেম্বর ১৯৭১)*

আগস্ট মাসে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে শেখ মুজিবের জীবন রক্ষার আবেদন করা হয়। ১০ আগস্ট তার গোপন বিচার শুরুর পর এ তৎপরতা পৃথিবীর সর্বত্র বৃদ্ধি পায়। ভারত সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘের নিকট এ বেআইনি বিচার বন্ধের জন্য সর্বপ্রকার পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান। *(সূত্র: বিচারপতি চৌধুরীর উল্লিখিত বই, পৃষ্ঠা ৯৩)।*

ভারতীয় পার্লামেন্টে ইন্দিরা গান্ধী বলেন, পশ্চিমা বিশ্বের সিভিল সোসাইটি এবং জনমত এবং ওইসব দেশের নেতাদের অনেকেই অনুধাবন করতে পেরেছেন যে শেখ মুজিবের মুক্তি অপরিহার্য। ইন্দিরা গান্ধী বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং পশ্চিম জার্মানি ভ্রমণ শেষে পার্লামেন্টে বলেছিলেন 'বেশিরভাগ

দেশই মনে করে যে শেখ মুজিবের মুক্তি একান্ত জরুরি এবং তারা পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের এ ব্যাপারটি উপলব্ধি করাতে চাপ প্রয়োগ করতে চান।'

৭ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে সেখানকার এনবিসি টেলিভিশনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন, 'সমস্যার আজ একমাত্র সমাধান পূর্ব বাংলার জনগণের নেতা শেখ মুজিবের সাথে পাকিস্তানি শাসকদের আলোচনা। তারা শেখ মুজিবকে বিশ্বাসঘাতক ঘোষণা করে গ্রেপ্তার করেছে, সেটা কোনো বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে না। এটা ছাড়া কোনো সমাধান হতে পারে না।'

আর এক প্রশ্নের জবাবে ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন, 'আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিমাদের কোনো বৃহৎ শক্তি ইয়াহিয়াকে বাধ্য করতে পারে শেখ মুজিবের সাথে আলোচনায় বসতে।'

বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে মুজিবনগর ভিত্তিক বাংলাদেশ সরকারের নিয়োগপ্রাপ্ত বিদেশ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর অবদানও অনস্বীকার্য। তিনি এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে কমনওয়েলথ মহাসচিব আর্নল্ড স্মিথের সঙ্গে সাক্ষাতে বাংলাদেশ পরিস্থিতি ব্যক্ত করলে মি. স্মিথ বলেন, তিনি ইয়াহিয়ার কাছে ব্যক্তিগতভাবে লিখবেন বাংলাদেশে রক্তপাত বন্ধ করতে এবং বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে। বিচারপতি চৌধুরী এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউম-এর সাথে দেখা করে বঙ্গবন্ধুর প্রাণ রক্ষার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর অনুরোধ করলে জবাবে স্যার আলেক বলেন, বৃটিশ সরকার এ ব্যাপারে যতদূর সম্ভব চাপ দিবেন। *(সূত্র: বিচারপতি চৌধুরীর উল্লিখিত বই, পৃষ্ঠা ১৬)*

জুলাই মাসের শেষ দিকে সামরিক আদালতে বঙ্গবন্ধুর বিচারে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিচারপতি চৌধুরী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নোবেল বিজয়ী আইরিশ নেতা, আইনজীবী শ্যোন ম্যাকব্রাইটকে পাকিস্তানে প্রেরণ করেন। কিন্তু পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ শ্যোন ম্যাকব্রাইটকে তা করতে দেয়নি।

১১ আগস্ট বিচারপতি চৌধুরী বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে এই মর্মে চিঠি লেখেন যে, শেখ মুজিব একটি স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রপতি বিধায় কোনো দেশের অধিকার নেই তার বিচার করার। তিনি চিঠিতে আশা প্রকাশ করেন ব্রিটিশ সরকার এতে হস্তক্ষেপ করবে। *(সূত্র: বিচারপতি চৌধুরী উল্লিখিত বইয়ের ৭৭ পৃষ্ঠা)*

বিচারপতি চৌধুরী আগস্টের শুরুতেই অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল-এর মহাসচিব মার্টিন এনালস এবং আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটির (আইসিআরসি) নিকট বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য আনুষ্ঠানিক দরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ৫ আগস্ট প্রখ্যাত ব্যারিস্টার অধ্যাপক ড্রেপারকে নিয়ে জেনেভা গমন করেন। সেখানে

ব্যারিস্টার ড্রেপার আইসিআরসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তার ব্যাপারে চেষ্টা করার দাবি জানান। *(বিচারপতি চৌধুরীর উল্লিখিত বই, পৃষ্ঠা ৭২)*

২৩ সেপ্টেম্বর বিচারপতি চৌধুরী ১৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি দল নিয়ে নিউ ইয়র্ক পৌঁছেন। এ ১৬ জনকে মনোনীত করেন মুজিবনগরভিত্তিক বাংলাদেশ সরকার। এ ১৬ জন ছিলেন– আব্দুস সামাদ আজাদ, এম আর সিদ্দিকী, সৈয়দ আব্দুস সুলতান, ডা. মফিজ চৌধুরী, সেরাজুল হক, ডা. আসহারুল হক, ফণি ভূষণ মজুমদার, ফকির সাহাবুদ্দিন, অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, ড. এ আর মল্লিক, অধ্যাপক রেহমান সোবহান, এ এফ এম আবুল ফতেহ, খুররম খান পন্নী, সৈয়দ আনোয়ারুল করিম, আবুল মাল আব্দুল মুহিত, এ এইচ মাহমুদ আলী। তারা জাতিসংঘে কর্মরত সাংবাদিক জে কে বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতিথিরূপে প্রতিদিন জাতিসংঘ ভবনে প্রবেশ করতেন। সেই সুযোগে তারা জাতিসংঘে বিভিন্ন দূতাবাসে লবিং করেন। দূতাবাসগুলো বলতো ভারতের স্বীকৃতির পরই শুধু বাংলাদেশের বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে মুসলিম দূতাবাসগুলোর মনের কোণে সংশয় লক্ষ্য করা গেছে। *(বিচারপতি চৌধুরীর উল্লিখিত পৃষ্ঠা : ১৬৯)*

ইন্দিরা গান্ধী এবং বিচারপতি চৌধুরীর পরপরই যাদের অবদানের কথা বলতে হয় তারা ছিলেন সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ–ব্রেজনেভ, পদগর্নি এবং কোসিগিন। ২৯ সেপ্টেম্বর লন্ডনের টাইমস পত্রিকায় লেখা হয়, ইতিপূর্বে কোনো সোভিয়েত নেতা এত শক্ত ভাষায় বাংলাদেশের বিষয় উল্লেখ করেননি যেমনটি করেছেন সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন। তিনি বলেছিলেন, 'পাকিস্তানের কার্যকলাপ একেবারেই সমর্থনীয় নয়। অত্যাচারের ফলে পূর্ব পাকিস্তান আবাস অযোগ্য হয়ে গেছে।'

৩০ সেপ্টেম্বর লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় লেখা হয়েছিল যে, ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস নিয়েই দেশে ফিরেছেন। ৩ এপ্রিল সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পদগর্নি বাংলাদেশে নির্যাতন বন্ধের দাবি জানিয়ে বলেছিলেন, শেখ মুজিবুরের গ্রেপ্তার তার মনে গভীর শংকার সৃষ্টি করেছে। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে ৩ এপ্রিল পাকিস্তানি ঘোষণার পরই পদগর্নি তার জীবনের নিরাপত্তার দাবি জানান।

আরও যেসব বিশ্ব বরেণ্য নেতারা বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য অবদান রেখেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন জার্মান নেতা নোবেল বিজয়ী উইলি ব্রান্ট, আইরিশ নেতা নোবেল বিজয়ী শ্যোন ম্যাকব্রাইট, ফরাসি দার্শনিক আঁদ্রে মালরো, মার্কিন নেতা এডওয়ার্ড কেনেডি, অ্যামনেস্টি প্রধান মার্টিন এনলস, ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউম, এমপি জন স্টোন হাউস, স্যার আর্থার বটমলি, ব্রুস

ডগলাস ম্যান, মাইকেল বার্নস, পিটার শোর, টবি জেসেল, ওয়ার অন ওয়ান্ট প্রধান ডোনাল্ড চেমওয়ার্থ, কমনওয়েলথ মহাসচিব আর্নল্ড স্মিথ।

১৭ সেপ্টেম্বর আঁদ্রে মালরো ৬৯ বছর বয়সে বজ্রকণ্ঠে বলেন, 'আমি পূর্ব পাকিস্তানে গিয়ে বাঙালি সমর নায়কের আদেশ অনুসারে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিতে প্রস্তুত', সে খবর লন্ডনসহ বিভিন্ন দেশের পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছিল।

বিশ্বের প্রভাবশালী নেতাদের উচ্চকণ্ঠ দাবির মুখে ইয়াহিয়া যে ভেঙ্গে পড়েছিল তার প্রমাণ মিলল ২২ সেপ্টেম্বর হেরাল্ড ট্রিবিউন পত্রিকার খবরে, যাতে লেখা হয়েছিল ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের সাথে আলোচনা করতে যাচ্ছেন।
৬ ডিসেম্বর ভারত এবং ভুটান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান পুরো দৃশ্যপট পাল্টে দিল এই অর্থে যে দুটি দেশের কূটনৈতিক স্বীকৃতির পর বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হওয়ায় বঙ্গবন্ধু সে দেশের রাষ্ট্রপতির মর্যাদা পেয়ে যান, যার ফলে তাকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের দ্রোহী হিসেবে বিচারে তোলা আন্তর্জাতিক আইনে অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়।

বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের নাগরিক বলে তার বিচার পাকিস্তানে হবে বলে ইয়াহিয়ার দাবি ভারত ও ভুটানের স্বীকৃতির পর পণ্ড হয়ে যায়, কারণ বাংলাদেশ তখন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে দুটি দেশের স্বীকৃতি লাভ করায় ইয়াহিয়া-ভুট্টো বাধ্য হন বঙ্গবন্ধুর বিচার বন্ধ করতে এবং অবশেষে তাকে মুক্তি দিতে। তবে বিষয়টি মোটেও সহজ ছিল না। আন্তর্জাতিক প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দের চাপ ছাড়া এটি কোথায় গিয়ে গড়াত তা আঁচ করা কঠিন।

আরো উল্লেখ্য যে, ১৯৭১-এর ১৩ জুন বাংলাদেশের সে সময়ের প্রধানমন্ত্রী শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহে চিঠি পাঠিয়ে বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পাকিস্তানের ওপর চাপ প্রয়োগের দাবি জানান।

সম্প্রতি এক খ্যাতনামা ব্যক্তি বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে অন্য আরেকজন ব্যক্তি মুখ্য অবদান রেখেছিলেন বলে যে দাবি করেছেন তা সম্পূর্ণরূপে উদ্ভট কল্পনা। সে ব্যক্তি পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিকভাবে স্বনামধন্য হলেও ৭১-এ তিনি ছিলেন অখ্যাত, অপরিচিত একজন। ৭১-এ বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য বাংলাদেশের কোনো অখ্যাত ব্যক্তি বিশেষের এ ব্যাপারে অবদান রাখার দাবি হাস্যকর, কেননা কোনো বাঙালি ব্যক্তি বিশেষ অবদান রাখার মতো অবস্থানে ছিলেন না, মুখ্য অবদান তো দূরের কথা, যা বলার অপেক্ষা রাখে না।♦

লেখক : আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি

জাতীয় সংসদে ভাষণ দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধুর সংসদ জীবনের শেষ দিনটি

বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম

২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংসদ জীবনের সর্বশেষ দিন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা। ওই দিন জাতীয় সংসদে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বিল পাসের মাধ্যমে দেশে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। নতুন ব্যবস্থায় বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি হন। দেশের

অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির প্রয়াসে গঠিত হয় একক জাতীয় দল 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)'। বঙ্গবন্ধু তাঁর এই পদক্ষেপ সম্পর্কে সংসদে প্রদত্ত শেষ ভাষণে বলেছিলেন, 'চেষ্টা নতুন, আজ আমি বলতে চাই– This is second revolution, second revolution আমাদের। এই revolution-এর অর্থ দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। এর অর্থ : অত্যাচার-অবিচার-নির্যাতন বন্ধ করতে হবে।... জনাব স্পিকার সাহেব, আজকে আমাদের সংবিধানের কিছু অংশ সংশোধন করতে হলো। আপনার মনে আছে, সংবিধান যখন পাস করা হয়, তখন আমি বলেছিলাম যে এই দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যদি দরকার হয় এই সংবিধানের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা হবে।... আজকে Amended Constitution-এ যে নতুন ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি, এটাও গণতন্ত্র। শোষিতের গণতন্ত্র। এখানে জনগণের ভোটাধিকার থাকবে। এখানে আমরা সমাজতন্ত্র করতে চাই। এখানে আমরা শোষিতের গণতন্ত্র রাখতে চাই। সাম্প্রদায়িকতার বীজ কোনো দিন বাংলার মাটিতে আসতে পারবে না, আমি allow করব না।'

শোষিতের গণতন্ত্র সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমি একদিন তো বলেছি এই হাউসে, স্পিকার সাহেব যে, আমরা শোষিতের গণতন্ত্র চাই। যারা রাতের অন্ধকারে পয়সা লুট করে, যারা বড় বড় অর্থশালী লোক, যারা বিদেশ থেকে ভোট কেনার জন্য পয়সা পায়, তাদের গণতন্ত্র নয়, শোষিতের গণতন্ত্র। এটা আজকের কথা নয়, বহুদিনের কথা আমাদের, এবং সে জন্য আজকে আমাদের শাসনের পরিবর্তন করতে হয়েছে।... আমাদের শোষণহীন সমাজ গড়তে হবে। এটায় আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।' বঙ্গবন্ধুর চিন্তায় পশ্চিমা ধাঁচের শুধু সাধারণ জনগণের ভোটদানের অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়টি ছিল না, তিনি বিশ্বাস করতেন ভোটের গণতন্ত্রের পাশাপাশি দেশের গরিব-দুঃখী-সর্বস্তরের মানুষের ভাত-কাপড়-বাসস্থান-চিকিৎসা নিশ্চিতভাবে পাওয়ার গণতন্ত্র, যা শোষিতের গণতন্ত্র।

সংবিধানের চতুর্থ সংশোধন সম্পর্কে আত্মোপলব্ধির জায়গা থেকে বঙ্গবন্ধু সংসদে আরো বলেছিলেন, 'সংবিধানের এই সংশোধন কম দুঃখে করি নাই, স্পিকার সাহেব। যারা জীবনভর সংগ্রাম করেছে– এ কথা যেন কেউ মনে না করে যে জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে গেছে। যদি জনগণ যা চেয়েছে, এখানে সেই System করা হয়েছে। তাতে পার্লামেন্টের মেম্বারগণ জনগণের দ্বারা ভোটে নির্বাচিত হবেন। যিনি প্রেসিডেন্ট হবেন, তাঁকেও জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে হবে। জনগণের ভোটাধিকার আছে।'

সংসদের শেষ ভাষণে বঙ্গবন্ধু দেশ ও সমাজ গড়তে শিক্ষিত লোকের ভূমিকা ও দায়িত্ব স্মরণ করে দিয়ে বলেছিলেন, 'জনাব স্পিকার, আজকে আমাদের কর্তব্য কতটুকু পালন করেছি– আমরা যারা এখানে লেখাপড়া শিখেছি? আজ দেশের মানুষ দুঃখী, না খেয়ে কষ্ট পায়। গায়ে কাপড় নাই, শিক্ষার আলো তারা পায় না, রাত্রে একটু হারিকেন জ্বালাতে পারে না, নানা অসুবিধার মধ্যে তারা চলছে। আজকে আত্মসমালোচনার দিন এসেছে– আমরা কতটুকু কর্তব্য পালন করেছি, আমরা কতটুকু তাদের দিয়েছি। শুধু আমাদের দাও! বাংলার দুঃখী জনগণ কী পেল, তোমরা কী ফেরত দিয়েছ? এটা আজ প্রশ্ন। আজ আত্মসমালোচনার প্রয়োজন রয়েছে।... দুঃখের বিষয়, আজ আমরা বলি, আমরা কী পেলাম। তোমরা কী পেয়েছ? তোমরা পেয়েছ শিক্ষার আলো, যে শিক্ষা পেয়েছ বাংলার জনগণের টাকায়। তুমি কী ফেরত দিয়েছ বাংলার দুঃখী মানুষকে, যে দুঃখী মানুষ না খেয়ে মরে যায়, যে মানুষের কাপড় নাই, যে মানুষ বন্ধু খুঁজে পায় না, যার বস্ত্র নাই, শার্ট নাই, বুকের হাড়গুলো পর্যন্ত দেখা যায়, তাকে আজকে তোমরা কি দিয়েছ?'

দেশের শিক্ষিত লোকরা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ায় সেদিন সংসদে বঙ্গবন্ধু উদ্বেগ ও উষ্মা প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'আজকে করাপশনের কথা বলতে হয়। এ বাংলার মাটি থেকে করাপশন উৎখাত করতে হবে। করাপশন আমার বাংলার কৃষকরা করে না। করাপশন আমার বাংলার মজদুর করে না। করাপশন করি আমরা শিক্ষিত সমাজ। যারা আজকে ওদের টাকা দিয়ে লখাপড়া করেছি। আজ

যেখানে যাবেন করাপশন দেখবেন– আমাদের রাস্তা খুঁড়তে যান– করাপশন। খাদ্য কিনতে যান– করাপশন, জিনিস কিনতে যান– করাপশন। বিদেশে গেলে টাকার ওপর করাপশন। তারা কারা? আমরা যে ৫ পারসেন্ট শিক্ষিতসমাজ, আমরা হলাম দুনিয়ার সবচেয়ে করাপ্ট পিপল, আর আমরাই করি বক্তৃতা। আমরা লিখি খবরের কাগজে, আমরাই বড়াই করি। আজ আত্মসমালোচনার দিন এসেছে। এসব চলতে পারে না। মানুষকে একদিন মরতে হবে। কবরে যেতে হবে। কিছুই সে নিয়ে যাবে না। তবুও মানুষ ভুলে যায়– কী করে এ অন্যায় কাজ করতে পারে!... বাংলার গরিব ভালো, বাংলার কৃষক ভালো, বাংলার শ্রমিক ভালো। যদি খারাপ হয়ে থাকে, তাহলে তারা বাংলার তথাকথিত শিক্ষিতসমাজ। তারাই যত গোলমালের মূল। যত অঘটনের মূল।'

বঙ্গবন্ধু ছাত্রসমাজকে লেখাপড়ার পাশাপাশি মানবিক গুণাবলি অর্জনের তাগিদ দিয়ে বলেছিলেন, 'ছাত্রসমাজের লেখাপড়া করতে হবে। লেখাপড়া করে মানুষ হতে হবে। জনগণ টাকা দেয় ছাত্রগণকে মানুষ হবার জন্য। সে মানুষ হতে হবে– আমরা যেন পশু না হই। লেখাপড়া শিখে আমরা যেন মানুষ হই। কী পার্থক্য আছে জানোয়ারের সাথে আর আমাদের সাথে? যে জানোয়ার একটি মানুষের বাচ্চাকে কামড়াইয়া ধরে, খেয়ে ফেলে দেয়, আর একটি মানুষ বুদ্ধিবলে এখান থেকে পয়সা নিয়ে তাকে না খাইয়ে মারে? কী পার্থক্য আছে জানোয়ার আর মানুষের মধ্যে– যদি মনুষ্যত্ব আমি হারিয়ে ফেলি, তাহলে মানুষ কোথায়? প্রথমেই আমার মধ্যে মনুষ্যত্ব আনতে হবে, তবে আমি মানুষ হব। না হলে মানুষ আমাকে কেন বলা হয়?

Because আমার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে। যখন মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলি তখন তো আমি মানুষ থাকি না। আমরা মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলেছি।'

স্বাধীনতাবিরোধী যাদের বঙ্গবন্ধু সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করেছিলেন তাদের বাংলাদেশবিরোধী অপতৎপরতা প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমরা যাদের ক্ষমা করেছিলাম তারা গ্রামে গ্রামে বসে আমাদের দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে আজকে কটাক্ষ করে। বন্ধ করে দেওয়া হবে সব। তাদেরকে অধিকার দেওয়া হবে স্বাধীনতা নস্যাৎ করার জন্য? কোনো দেশে দেয় নাই, আমরা দিয়েছিলাম মাফ। মাফ যদি হজম করতে না পারা যায়, তাহলে কেমন করে কঠোর হস্তে দমন করতে হয় তা-ও আমি জানি। আজ আমাকে অত্যন্ত দুঃখের সাথে এ কথা বলতে হচ্ছে।'

বঙ্গবন্ধু মন্ত্রী-জনপ্রতিনিধি-সরকারি কর্মকর্তাদের নিজ নিজ মানসিকতা পরিবর্তনের অবস্থান জানিয়ে বলেছিলেন, 'যারা তোমায় মাহিনা দেয়, তোমার সংসার চালায়, ট্যাক্স দেয়, তার কাছে তুমি আবার পয়সা খাও! মেন্টালিটি চেইঞ্জ করতে হবে। সরকারি কর্মচারী, মন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট– আমরা জনগণের সেবক,

আমরা জনগণের মাস্টার নই। এই মেন্টালিটি আমাদের চেইঞ্জ করতে হবে। আর যাদের পয়সায় আমাদের সংসার চলে, যাদের পয়সায় আমাদের রাষ্ট্র চলে, যাদের পয়সায় আজ আমাদের embassy চলে, যাদের পয়সায় আমরা গাড়ি চড়ি, যাদের পয়সায় আমরা পেট্রল খরচ করি, আমরা কার্পেট ব্যবহার করি, তাদের জন্য কী করলাম– সেটাই আজ বড় জিনিস।'

বঙ্গবন্ধু তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে অসংখ্যবার কারাগারে গিয়েছিলেন, বিচারের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা দিয়ে অনুধাবন করেছিলেন বিচারব্যবস্থার আমূল সংস্কার প্রয়োজন। সংসদের শেষ ভাষণে তিনি বললেন, 'জাস্টিস ডিলেইড, জাস্টিস ডিনাইড। উই হ্যাভ টু মেইক এ কমপ্লিট চেইঞ্জ এবং সিস্টেমের মধ্যে পরিবর্তন করতে হবে, মানুষ যাতে সহজে বিচার পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিচার পায়। ব্যাপক পরিবর্তন দরকার। কলোনিয়াল পাওয়ার এবং রুল দিয়ে দেশ চলতে পারে না। নতুন স্বাধীন দেশ, স্বাধীন মতবাদ, স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করতে হবে। যেখানে জুডিশিয়াল সিস্টেমের অনেক পরিবর্তন দরকার।'

বঙ্গবন্ধু দেশের মানুষের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, 'আমি তাই হাউস থেকে, জনাব স্পিকার, আপনার মাধ্যমে দেশবাসীকে, দল-মত-নির্বিশেষে সকলকে বলব, যাঁরা দেশকে ভালোবাসেন, চারটি principle-কে ভালোবাসেন– জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা– এই চারটিকে, তাঁরা আসুন, কাজ করুন। দরজা খোলা আছে। সকলকেই আহ্বান জানাচ্ছি, যাঁরা এই মতে বিশ্বাস করেন। যাঁরা এই মতে বিশ্বাস করেন, তাঁদের প্রত্যেকেই আসুন, কাজ করুন, দেশকে রক্ষা করুন। দেশকে বাঁচান, মানুষকে বাঁচান, মানুষের দুঃখ দূর করুন। আর দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, চোরাকারবারিদের উৎখাত করুন।... আজকে আমরা যারা এখানে উপস্থিত আছি, যারা জনপ্রতিনিধি, জনগণের ভোটের মাধ্যমে যারা এখানে এসেছি, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে : জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে, দলমত-নির্বিশেষে, বাংলার জনগণ যে যেখানে আছেন আজকে থেকে আমরা প্রতিজ্ঞা করে নতুন জীবন শুরু করব। আমরা নতুন বিপ্লব শুরু করব।... তাই আজকেও আমাদের নতুন জীবন সৃষ্টি করতে হবে। উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে হবে। মানুষকে mobilize করতে হবে।'

বঙ্গবন্ধু সংসদ জীবনের ইতি টানতে গিয়ে বলেছিলেন, 'আজ আপনারা Constitution সংশোধন করে আমাকে প্রেসিডেন্ট করে দিয়েছেন। আমার তো ক্ষমতা কম ছিল না। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সমস্ত ক্ষমতা আপনারা আমাকে দিয়েছিলেন।... এই সিটে আমি আর বসব–না এটা কম দুঃখ না আমার।

আপনাদের সঙ্গে এই হাউসের মধ্যে থাকব না, এটা কম দুঃখ না আমার।' বঙ্গবন্ধু সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন, 'যদি সকলে মিলে আপনারা নতুন প্রাণ, নতুন মন নিয়ে খোদাকে হাজির নাজির করে, নিজের আত্মসমালোচনা করে, আত্মসংশোধন করে, আত্মশুদ্ধি করে যদি ইনশাআল্লাহ কাজে অগ্রসর হন, বাংলার জনগণকে আপনারা যা বলবেন তারা তাই করবে।... ইনশাআল্লাহ আমরা কামিয়াব হব।'

যুদ্ধবিধ্বস্ত, অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু দেশটিকে বঙ্গবন্ধু মাত্র সাড়ে তিন বছরের প্রচেষ্টায় যখন স্বাভাবিক স্থিতি ধারায় ফিরিয়ে এনে বাংলার গরিব-দুঃখী মানুষের সামগ্রিক মুক্তির লক্ষ্যে জাতীয় ঐক্যের সূচনা করে দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা করলেন, ঠিক সে মুহূর্তে স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে দেশকে আবারও পাকিস্তানি ধারায় ফিরিয়ে নেওয়ার অপতৎপরতায় লিপ্ত হয়।

হাল সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও মহল জাতীয় ঐক্যের কথা বলে, আহ্বান জানায়, রাষ্ট্র পরিচালনায় সব রাজনৈতিক দল পেশা-শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণ দাবি করে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালে সংবিধান সংশোধন করে তো সেই পদক্ষেপই গ্রহণ করেছিলেন। নতুন শাসনব্যবস্থায় আওয়ামী লীগ দল ছাড়াও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কয়েকজনকে মন্ত্রিপরিষদে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। জাতীয় দল 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' (বাকশাল) গঠন করেছিলেন স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল রাজনৈতিক দল ও শক্তির সমন্বয়ে। দুর্ভাগ্য এটাই যে আজ যাঁরা জাতীয় ঐক্যের কথা বলেন, তাঁরাই সেদিন বঙ্গবন্ধুর গৃহীত পদক্ষেপের বিরোধিতা-সমালোচনা করেছিলেন।

জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধুর শেষ ভাষণে উচ্চারিত উপলব্ধি-আহ্বানগুলো যদি আমরা নিজ নিজ অবস্থানে থেকে আত্মস্থ, লালন ও চর্চা করতে পারি, তাহলে নিঃসন্দেহে আত্মগর্ব নিয়ে বলতে পারব, আমরা বঙ্গবন্ধুর কাঙ্ক্ষিত সোনার মানুষ হয়েছি। সোনার মানুষ হিসেবে নিজেদের তৈরি করার অঙ্গীকার হোক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে।♦

লেখক : বিচারপতি, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগ এবং সাবেক চেয়ারম্যান আন্তর্জাতিক অপরাধট্রাইবুনাল-১, বাংলাদেশ

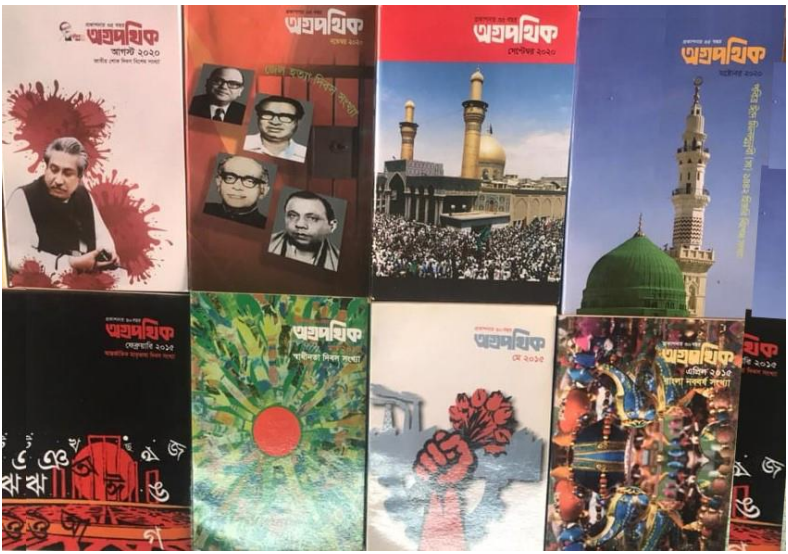

২৬ বছরে অগ্রপথিক

সময়ের সারথী অগ্রপথিক

শামস সাইদ

দীর্ঘ তিন যুগ পেড়িয়ে সুদীর্ঘ এক ইতিহাসের পথযাত্রার অংশ হতে চলছে ইসলামী ফাউন্ডেশনের সৃজনশীল ও মননশীল পত্রিকা অগ্রপথিক। এই দীর্ঘ পথ চলায় অগ্রপথিকের সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন, লেখক, সম্পাদক, পাঠকসহ সংশ্লিষ্ট সকলেই হয়ে গেছেন অগ্রপথিকের অগ্রযাত্রার সারথী। পাঠক হিসেবে অগ্রপথিকের সাথে আমার পরিচয় বহুদিনের। লেখক হিসেবেও বহু দিন হয়ে গেল। অগ্রপথিকে যখন লেখা শুরু করি তখন সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছিলেন, শ্রদ্ধেয় অগ্রজ লেখক, সাংবাদিক আনোয়ার কবির। এখনো পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্বে রয়েছেন তিনি। মূলত তার জন্যই এই পত্রিকায় লেখা শুরু করেছিলাম। সেই থেকে আজও লিখে যাচ্ছি। শুধু লিখছি না। অনেক কারণেই আমার প্রিয় পত্রিকা হয়ে উঠেছে অগ্রপথিক।

দীর্ঘ এই তিন যুগের পথ চলায় অগ্রপথিক যে সবসময় একই গতিতে চলেছে এমন নয়। মাঝে মাঝে নানা কারণে হোঁচটও খেয়েছে। তবে সব প্রতিকূলতা পেরিয়ে পত্রিকাটি ছত্রিশ বছরে পা রাখতে পেরেছে সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। আসলে একটা পত্রিকা বেঁচে থাকে তার লেখক, পাঠক ও সম্পাদকের ওপর নির্ভর করে। প্রধান দায়িত্বটা মূলত পালন করেন সম্পাদক। সেটা ভালো লেখা প্রকাশ করে পাঠকের মনোজগতকে সমৃদ্ধ করার মধ্যে দিয়েই নয়, একজন সত্যিকারের সম্পাদক, লেখক সৃষ্টিতে কিংবা নবীন লেখকদের তুলে ধরতে বড় ধরনের ভূমিকা রাখেন বা রাখতে পারেন।

সম্পাদক পদটা গুরত্বপূর্ণ। আর অগ্রপথিক শুধু সাহিত্য পত্রিকা নয়, এটি একটি সৃজনশীল ও মননশীল পত্রিকা। তাই এই পত্রিকার সম্পাদক লেখকের মতোই সময়ের সার্থক প্রতিনিধি। লেখক যেমন সময়, সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে দায়বদ্ধ তেমনি সম্পাদকও। আগেই বলেছি সম্পাদকের রুচি, চিন্তা ও আদর্শের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে পত্রিকার শরীর। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একটি লেখা প্রকাশের উপযোগী করে তুলতে দ্বিতীয় স্রষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয় সম্পাদককে। তাই সম্পাদকের পরিপক্ব ও পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা অনিবার্য। লেখকের থেকে আরও এক ধাপ এগিয়ে থাকতে হয় সম্পাদককে। সেটা জানাশোনার ক্ষেত্রে। নাহয় শিল্প ও শিল্পী উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাঠকের কাছে চলে যায় ভুল মেসেজ ও দুর্বল লেখা। এক্ষেত্রে সম্পাদককে হতে হয় নির্ভীক। ভুলকে ভুল চেনা ও সঠিকটা বেছে নেওয়ার মতো নিজেকে যোগ্য করে তুলতে হয়। শুধু সম্পাদনাই না, লেখা নির্বাচন করারও একটা বড় ব্যাপার। এক্ষেত্রে অগ্রপথিক অন্য অনেক পত্রিকার থেকে আলাদা। পাঠক সমৃদ্ধ লেখা ও লেখার শিল্পমান রক্ষায় অগ্রপথিক সম্পাদক আনোয়ার কবির নির্ভীক। কোনো আপোস করতে চান না। করেনও না। তথাপিও যে, দুর্বল লেখা ছাপা হয় না এমনও নয়। কারণ সব সময় মানসম্মত লেখা পাওয়াও কঠিন। তবু তার প্রচেষ্টায় কমতি নেই।

অন্য অনেক পত্রিকার থেকে অগ্রপথিক আলাদা হওয়ার কারণ, অন্য পত্রিকাগুলো একটি ধারার লেখা দিয়ে প্রকাশিত হয়। অগ্রপথিক সম্পূর্ণ দুটি আলাদা পথকে এক করে বহু মতের লেখা প্রকাশ করে। ইসলামের নানা অনুসঙ্গ উপজীব্য করে লেখা যেমন প্রকাশিত হয় এই পত্রিকায় তেমনি সৃজনশীল ধারার লেখাও প্রকাশিত হয়। আবার রাজনৈতিক প্রবন্ধ, অনুবাদ সাহিত্যও একই সাথে প্রকাশিত হচ্ছে। দুই ধারার লেখকদের চিন্তা এখানে এসে এক মলাটে বন্দী হচ্ছে। ইসলামী স্কলাররাও যেমন এখানে লিখে থাকেন তেমনি এই পত্রিকার লেখক যতীন সরকার, জাফর ইকবালসহ দেশের প্রথিতযশা প্রবীণ ও নবীন চিন্তাশীল লেখকরাও। এই দুই ধারাকে একত্র করে পত্রিকাটিকে এক অনন্য

জায়গায় নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন আনোয়ার কবির। এর আগেও দেশের প্রখ্যাত লেখকরা অগ্রপথিক ও সবুজ পাতায় লিখেছেন। এমন কি আহমদ ছফাও ছিলেন এই পত্রিকার লেখক। হয়তো মাঝখানে ছন্দ পতন হয়েছিল। সেই জায়গাটা আবার গড়ে তুলতে পেরেছেন বর্তমান সম্পাদক তার একান্ত প্রচেষ্টায়। পত্রিকাটিকে করতে পেরেছেন সর্বজনীন। সে লেখক ও পাঠক উভয় ক্ষেত্রেই। এতে পত্রিকার যেমন গুরুত্ব বেড়েছে তেমনি পাঠকমহলও বিচিত্র চিন্তার লেখা একই পত্রিকায় পেয়ে শাণিত করতে পারছেন তাদের চিন্তার তরবারী।

এবার আসি অন্য কথায়। তরুণ লেখকদের একটা অভিযোগ প্রায়শই শোনা যায় যে, তাদের ভালো লেখাও পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে না। কেন ছাপা হচ্ছে না? একজন সম্পাদকের কাজই ভালো লেখা ছাপা। তরুণদের খুঁজে বের করা। তাদের জায়গা করে দিয়ে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া। কিন্তু নির্মম হলেও তরুণদের এই অভিযোগ অনেকাংশে সত্য। তরুণরা আজকাল সৃজনশীল পত্রিকাগুলোতে সহজে জায়গা পাচ্ছে না। জায়গা করে নিতে হচ্ছে বহু কাঠখড় পুড়িয়ে। পত্রিকা খোললে দেখা যায় প্রতিষ্ঠিত ও প্রভাবশালী লেখকদের লেখায় ঠাসা। আবার অনেক তরুণ জায়গা পাচ্ছে প্রবীণদের হাত ধরে, না হয় গোষ্ঠীর্চচার মধ্য দিয়ে আসতে হচ্ছে তাকে। সেটা যে খুব সহজ হয় এমনও নয়। আর একটা সহজ উপায় আছে তরুণদের জন্য সেটা নিজেকে জনপ্রিয় করে তোলা। যারা নিজেকে জনপ্রিয় করে তুলতে পেরেছে তারা সহসাই দেশের নামি

দামি পত্রিকায় জায়গায় পেয়ে যাচ্ছে অনেক দুর্বল লেখা নিয়েও। এই চিন্তা তরুণদের মননশীল বিকাশের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলেও পত্রিকায় জায়গা করে নেওয়ার জন্য কিংবা পাঠকের কাছে পৌঁছে যাওয়ার জন্য এই পথেই ছুটছে অনেক তরুণ।

এ ক্ষেত্রেও অগ্রপথিক সম্পূর্ণ আলাদা। এক দিকে দেশের খ্যাতিমান লেখকদের লেখা যেমন ছাপা হচ্ছে অন্যদিকে একদম তরুণ লেখকের লেখাও ছাপা হচ্ছে। এটাই হচ্ছে একজন সম্পাদকের বৈশিষ্ট্য। আনোয়ার কবির তরুণদের বিশাল জায়গা করে দিতে চান। কেননা তিনি বিশ্বাস করেন আজকের তরুণরাই আগামী দিনে খ্যাতিমান। তাই অগ্রপথিকে প্রবীণদের মতোই গুরুত্বসহকারে স্থান পায় তরুণরা। তার আহ্বানেই লেখা শুরু করেছিলাম অগ্রপথিকে। এই লেখাটাও তার ফোনের পর ফোন পেয়ে লিখতে বাধ্য হচ্ছি এক প্রকার। এই লেখাটা অনেক প্রবীণকে দিয়েও লেখাতে পারতেন তিনি। কিন্তু লেখাননি। আমাকে বাধ্য করছেন লিখতে। কারণ, তিনি চাচ্ছেন তরুণরাও হয়ে উঠুক গুরুত্বপূর্ণ।

একজন সম্পাদকের অন্যতম কাজ হচ্ছে লেখকদের দিয়ে লেখাটা লিখিয়ে নেওয়া। কয়জন সম্পাদক এমন আছেন যিনি লেখকদের দিয়ে প্ল্যানমাফিক লেখাটা লিখিয়ে নিচ্ছেন বা গুরুত্ব দিচ্ছেন? এক সময় এই প্রথা খুব বেশি চালু ছিল। এখন সেই প্রথা অনেকটা বিলুপ্তির পথে। লেখা আসে। তা দিয়ে দায়সারাভাবে পত্রিকা ছাপিয়ে দিচ্ছেন। এমন কী এডিটও করেন না। হুবহু ছাপা হচ্ছে। এতে যেমন লেখক তার অসংগতি ধরতে পারেন না তেমনি পাঠকও একটি ভালো লেখা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আবার অনেক সময় দেখা যায় লেখা না, ছাপা হচ্ছেন লেখক। ছাপা হচ্ছে তার প্রভাব। তার জনপ্রিয়তা। সম্পর্কও ছাপা হয় এখন। সুপারিশের ঢেকিও বাদ যায় না। তাই পাঠকও আজকাল পত্রিকা থেকে অনেকটা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। কেননা এতসব চিন্তা পাঠকের নেই। লেখকের প্রভাব, প্রতাপ তারা দেখেন না। তারা একটা ভালো লেখার জন্য মুখিয়ে থাকেন। সেটা যখন না পান তখন হতাশ হন। এখানে এসে অগ্রপথিক আলাদা জায়গা করে নিয়েছে। খ্যাতিমান লেখক যতীন সরকার অগ্রপথিক পত্রিকা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে এত ভালো পত্রিকা বের হয়! এটা আসলেই বিস্ময়কর। অবিশ্বাস্যও বলে মনে হয়। লেখার বৈচিত্র্য বিষয়বস্তু দেখে এই প্রশ্ন আমার মনেও জাগ্রত হয়েছিল। আবার মুগ্ধও হয়েছিলাম। কারণ সরকারি অনেক প্রতিষ্ঠান থেকে পত্রিকা বের হয়। নাম নাই বললাম। সেসব ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেকটা দায়সারাভাবে ছাপা হচ্ছে। প্রকাশ

করতে হবে তাই প্রকাশ করেন। কারণ তারা চাকরি করেন। কাজটা করতে হবে। তাই করেন। তাদের ভেতর পেশাদারিত্ব নেই। একজন সম্পাদকের চাকরির আগে থাকতে হয় পেশাদারিত্ব। পেশাদারিত্ব থাকলেই পত্রিকার পাতা ভরে উঠবে বিষয় বৈচিত্র্যে ও মানসম্পন্ন লেখায়। পাঠকের কাছেও জায়গা করে নিবে পত্রিকা তার লেখার শক্তিতে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত অগ্রপথিক অন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে বের হওয়া পত্রিকা থেকে কেন আলাদা? এমন একটা একটা প্রশ্ন জাগতেই পারে। কারণ এখানে সম্পাদকের পেশাদারিত্ব রয়েছে। আনোয়ার কবির যতটা না চাকরি করেন তার থেকে বেশি পেশাদারি দায়িত্ব পালন করেন। তার কাছে গোষ্ঠী নেই। প্রভাবশালী লেখকের তকমা দেখেন না। জনপ্রিয় লেখকের লেজ ধরে মাথা খোঁজার চেষ্টা করেন না। তিনি ভালো লেখাকে যথাযোগ্য মূল্যায়ন করেন। আমি দেখেছি একটি ভালো লেখার জন্য কতটা মরিয়া হয়ে ফোন করেন তিনি। কাঙ্ক্ষিত লেখাটা পেয়ে গেলে দেখেছি তার উচ্ছ্বাস। ফোন করে বলেন শামস এই সংখ্যায় বেশ ভালো লেখা পেয়েছি। সংগ্রহে রাখার মতো একটা সংখ্যা হবে। আমি অবাক হই। ভালো লাগে এমন একজন মানুষ আছেন তা ভেবে। যিনি এখনও ভালো লেখা খুঁজে বেড়ান। এখানে একটুও বাড়িয়ে বলিনি। যারা অগ্রপথিকে লিখেন তারা অবশ্যই এই বিষয়টি জানেন। আর পত্রিকা হাতে নিলে পাঠক বুঝতে পারেন একজন সম্পাদক কতটা দায়িত্বশীল।

পত্রিকা সম্পাদনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই লেখক ও সম্পাদক একে অন্যের পরিপূরক। কারণ, একটি লেখা শেষ করে লেখক অনেক সময় তার দায়িত্ব শেষ মনে করেন। কিন্তু লেখাটি সুখপাঠ্য ও শিল্পিত করে পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সম্পাদকের ভূমিকা অপরিসীম। সম্পাদকের দায়িত্ব প্রতিটি লেখা মনোযোগসহকারে পড়ে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করা এবং সম্পাদনা করা। এর জন্য সম্পাদকের জানাশোনা, পড়াশোনা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে নিজেকে শাণিত করা, পরিশীলিত করা দরকার। এরকম প্রজ্ঞাবান সম্পাদক ক'জন আছেন? লেখা প্রকাশের মধ্য দিয়েই একজন সম্পাদকের প্রকৃতি পরিচয় ও যোগ্যতার বিচার করা যায়। আবার নতুন লেখক আবিষ্কার করা। তাদের পরামর্শ ও মনিটরিংয়ের মাধ্যমে বিকাশের সুযোগ দিয়ে ভালো মানের লেখা সংগ্রহ এবং লেখককে উৎসাহের কাজটাও করে আসছে অগ্রপথিক।

একটি লেখা পাঠোপযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে বানান সংশোধন, বাক্যের গঠন, ছোটখাটো পরিবর্তন, পরিবর্ধন, শব্দের অপপ্রয়োগ, মার্জিত ও সংশোধন

তথা ব্যাকরণ সংশ্লিষ্ট ভুলগুলো লেখকের অগোচরেই সম্পাদকের চোখে পড়ে। তাই প্রতিটি লেখাই প্রকাশের আগে সম্পাদকের টেবিল ঘুরে আসা আবশ্যক। সম্পাদকের দৃষ্টি পড়লে লেখাটি হয়ে উঠতে পারে অন্যরকম।

অপ্রিয় হলেও সত্য যে, বর্তমানে আমাদের দেশে যোগ্য সম্পাদকের বড় অভাব। লেখক বাড়ছে সে তুলনায় অভিজ্ঞ সম্পাদক একেবারেই হাতে গোনা। অনেক সময় সম্পাদনা ছাড়া লেখা বা বই প্রকাশিত হওয়ায় পাঠকের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আবার কোনো কোনো শব্দের অর্থ না বুঝে কেটেছেঁটে নিজের মতো করে বসিয়ে দেওয়ার কারণেও লেখার মান হালকা হয়ে যায়। তাই সম্পাদকের জানাশোনা ও অভিজ্ঞতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে অগ্রপথিকের সম্পাদক দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনের অভিজ্ঞতা ও লেখক জীবনের জানাশোনা এক করে অগ্রপথিককে ভিন্নমাত্রায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন।

অনেক সময় মফস্বলের লেখকদের লেখাকে মূল্যায়ন করা হয় না, বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়। এমন কি লেখাটি পড়ে দেখার প্রয়োজনীয়তাও মনে করেন না। পাশের ঝুড়িতে ফেলে দেন। আবার অপরিচিত লেখা হলে মেইলটা ওপেনও করেন না। বিষয়টি পীড়াদায়ক। অগ্রপথিক দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পাঠকের কাছে যেমন চলে যাচ্ছে তেমনি প্রান্তিক লেখকদের লেখাও ছাপা হচ্ছে গুরুত্বসহকারে। এখানে গ্রাম আর শহর নেই। লেখকের বয়স নেই। এখানে মূলত লেখাকেই মূল্যায়ন করা হয়।

লেখকদের কাছে তার প্রতিটি লেখা নিজের সন্তান তুল্য। দশমাস দশদিন একটি সন্তানকে মা যেমন গর্ভে ধারণ করেন তেমনি একটি লেখা যত্ন, ভালোবাসা ও ত্যাগের বিনিময়ে তৈরি করেন লেখক। তার মূল্যায়নও আশা করেন একজন সম্পাদকের কাছ থেকে। যখনই পত্রিকায় একটা লেখা প্রকাশ হয় তখন লেখকের উৎসাহ উদ্দীপনাও বেড়ে যায়। আবার নিজের দুর্বলতাও বুঝতে পারেন লেখক। নিজেকে সুধরেও নিতে পারেন।

শুধু বানান সংশোধন নয়; একটি লেখাকে পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি, সুন্দর, মার্জিত ও রুচিশীল করতে সম্পাদকের ঘাম জড়াতে হয়। নিরলস পরিশ্রম করে সেটাকে মানসম্পন্ন করে তোলার চেষ্টা করেন। তাই সম্পাদকের প্রতি লেখকের নির্ভরশীলতা ও আস্থার জায়গাটি তৈরি করা জরুরি। লেখক তার চিন্তা, চেতনা, ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটান লেখার মাধ্যমে। যদিও সব লেখকের লেখার মান কিংবা বিষয়বস্তু এক নয়, কিন্তু লেখাটি স্বাচ্ছন্দ্যে পড়ার বিষয়টি মাথায় রাখতে হয় সম্পাদককে। সময় করে পড়ার পরে দেখা গেল সেটা একদমই ছাপার যোগ্য করে তোলা সম্ভব না। তবু পড়তে হয়। তারপর ফেলে দিতে হয়। লেখার বিষয়ে

লেখককে পরামর্শ থাকলে দিতে পারেন। এর মধ্য দিয়ে হয়তো বেরিয়ে আসতে পারে নতুন কোনো লেখক।

অগ্রপথিকে যেমন ইসলামী ভাবধারার চিন্তাশীল লেখা ছাপা হয় তেমনি মননশীল প্রবন্ধও ছাপা হয়। আবার রাজনৈতিক লেখাও প্রকাশ হয়। থাকে গল্প, অনুবাদ গল্প, কবিতা এমন কী বিশেষ ব্যক্তিদের স্মরণে তাদের জীবনী প্রবন্ধও স্থান পায়। থাকে বই পরিচিতিও। কী নেই ছোট্ট এই পত্রিকাটিতে! তা-ই ভাববার বিষয়। গদ্যরাশি, গল্প, কাব্য-কথন ও পাঠ-পর্যালোচনা রয়েছে, যা প্রশংসার দাবি রাখে প্রশ্নাতীতভাবে। নতুন আর পরিচিত অপরিচিত লেখকদের লেখার মিলনমেলায় ভরপুর এ পত্রিকাটি। অনেকটা নির্ভুল বানান ও বিষয়বস্তু পত্রিকাটির গুরুত্বপূর্ণ অলংকার। নানান ধারার ও ধরণের লেখা সংযোজিত হয় এর পাতায় পাতায়, যা পাঠকদের বিভিন্ন রকমের স্বাদ দিতে কৃপণতা করে না। অগ্রপথিকে মুক্তচিন্তা, মুক্তবুদ্ধি চর্চার পাশাপাশি থাকছে বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ, একুশ ও স্বাধীনতাভিত্তিক লেখা। নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিকের ওপর লেখাও বিশেষ ছাপা হয়। তাদের লেখা অনুবাদ করে বাঙালি পাঠকের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টাও রয়েছে। আরব দেশগুলোর লেখকদের লেখা গল্প, প্রবন্ধের অনুবাদ বিশেষ জায়গা পায় এখানে। রুমী, সাদী, গালিব, আমীর খসরুসহ বিখ্যাত সাহিত্যিকদের লেখা নিয়ে সমৃদ্ধ একেকটা সংখ্যা আসলেই পাঠককে চমকে দেয়।

ছত্রিশ বছর ধরে অগ্রপথিক চিন্তাশীল ও সুস্থধারার লেখা প্রকাশের মধ্য দিয়ে পাঠকের চিন্তার উন্নয়নে যে ভূমিকা রেখে আসছে তা অনস্বীকার্য। আশাকরি এই ধারা অব্যাহত থাকবে। অগ্রপথিকের কাছ থেকে প্রাপ্তির ঝুলিটা বেশ বড়। লেখক, পাঠক তৈরিতে এই পত্রিকাটির বেশ ভূমিকা রয়েছে। তবে একটা পরামর্শ রয়েছে অগ্রপথিকের জন্য। বিজ্ঞান ও ধর্মের যে সম্মিলন রয়েছে সেসব বিষয়ে তথ্যবহুল গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশ করতে পারে অগ্রপথিক। এতে করে পাঠক উপকৃত হবে বলে বিশ্বাস রাখি। বুঝতে পারবে ধর্ম ও বিজ্ঞান আলাদা নয়। একে অপরের সম্পূরক। এ বিষয়ে গবেষণা না থাকার কারণে অনেকক্ষেত্রে ধর্মীয় গোঁড়ামী পরিলক্ষিত হয়। আবার বিজ্ঞান নিয়ে অতি উৎসাহী এক শ্রেণি ধর্মকে কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। এ বিষয়ে অগ্রপথিক বড় রকমের ভূমিকা রাখতে পারে।

আগামী দিনেও অগ্রপথিক নবীন ও প্রবীণের লেখায় সমৃদ্ধ হবে। অগ্রপথিক হয়ে উঠবে আরও বেশি সমৃদ্ধ। কারণ একটি পত্রিকা সমাজ ও রাষ্ট্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। ছড়িয়ে দিতে পারে সুস্থ ও সুন্দর চিন্তা। অগ্রপথিক ছত্রিশ বছরের ধারাবাহিকতায় সেই কাজটি আরও গুরুত্বসহকারে করবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি।♦

ফিরে দেখা

সালতামামি-২০২০

খান চমন-ই-এলাহি

সময়ের কথা ইতিহাসের কথা আজ যা বর্তমান, আগমীকাল তা ইতিহাস। এমন কী আগামী কাল যা সংঘটিত হবে তা ঐ দিন বর্তমান এবং পরের দিন অতীত। এই দিন অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের এই মহা পৃথিবীর কালচক্র।

ইতোমধ্যে নিঃশেষ হয়েছে ইংরেজি সন- ২০২০। ২০২১ এ করোনা ভাইরাস বা কোভিড ১৯ এর কারণে ২০২০ সাল অস্থিরতায় পূর্ণ ছিল। স্বস্তি ছিল না উত্তর থেকে দক্ষিণ পূর্ব থেকে পশ্চিম। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও বৈশ্বিক জীবনে নেমে আসে চরম হতাশা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নেমে আসে বিপর্যয়। মৃত্যু হাতছানি দেয়, মৃত্যু কেড়ে নেয় জীবন। মৃত্যু কেড়ে নেয় ভালোবাসা। মানুষের ভুল ভ্রান্তি বিপদের আনেক। মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের সাবধানতার জন্যও জনপদ সমূহে আজানা কিংবা

নতুন নতুন রোগ বালাই দিয়ে থাকেন যাতে মানুষ আল্লাহর পথে ফিরে আসে মানবিক হয়।

২০২০ সাল দেশ ও বিদেশ বাংলাদেশ ও বই বিশ্বের জন্য নানা গুরুত্বপূর্ণ বার্তা নিয়ে এসেছিল, এই ২০২১ সালে এসে তা ইতিহাসের পাঠ্য হয়ে স্মৃতির আয়নার ভেসে উঠেছে।

জানুয়ারি

বাঙালি, বাংলাদেশ ও পৃথিবী বাসীর জন্য অনন্য একটি দিন ১০ জানুয়ারী। এদিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপনের ক্ষণগণনা বা Countdown উদ্বোধন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের সরকার বাংলাদেশের স্থপতির প্রতি দায়িত্ব পালন করে। ইতিহাসের প্রকৃত চেতনায় ফিরে যায়।

১৪ জানুয়ারী ভারতে বাংলাদেশ বেতারের সম্প্রচার শুরু হয়।

১৫ জানুয়ারী বিশ্ব অর্থনীতির দুই পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে দেড় বছরের ও বেশি সময় ধরে চলা বাণিজ্য যুদ্ধ শিখলে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

২১ জানুয়ারী মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চ কক্ষ ছিনেটে প্রেসিডেন্ট ডোনাল ট্রাম্পের অভিশংসন বিচার শুরু।

২৩ জানুয়ারী রোহিঙ্গাদের গণহত্যা থেকে সুরক্ষায় আন্তজাতিক বিচার আদালতে (ICJ) সর্ব সম্মতভাবে মিয়ানমারে প্রতি চার দফা অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করে।

২৯ জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের (BDF) দুদিন ব্যাপি বৈঠক শুরু। জানুয়ারীর শেষ দিন ৩১ জানুয়ারী ছিল ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্য ঐতিহাসিক দিন। এদিন ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে যুক্তরাজ্য বিচ্ছেদ ঘটায়।

ফেব্রুয়ারি

১ ফেব্রুয়ারী ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

৩ ফেব্রুয়ারী রাজশাহীতে দেশের তৃতীয় ফরেনসিক ল্যাব উদ্বোধন করা হয়।

১০ ফেব্রুয়ারী যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা ও ইউরোপের সংস্থা ESA র যৌথ উদ্দেগে উৎক্ষেপন করা হয় প্রথম সৌর আরবিটর বা সোলো (SOLO)

১১ ফেব্রুয়ারী নভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে ফ্লুর মতো উপসর্গ নিয়ে যে রোগ হয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) তার নামকরণ করে COVID-১৯ (কোভিড ১৯)।

২৫ ফেব্রুয়ারী ঢাকার মিরপুরে অনুষ্ঠিত জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টেস্টে ইনিংস ও ১০৬ রানের বিশাল ব্যবধানে জয়লাভ করে বাংলাদেশ।

মার্চ

১ মার্চ সার্কের ১৪ তম মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন শ্রীলংকার এসলা ওয়োরাকুন।

৩ মার্চ সব ধরনের বই বিক্রির ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর (VAT) ছাড় দিয়ে একটি বিশেষ আদেশ জারি করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR)।

৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো তিনজনের শরীরে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ে বলে ঘোষণা দেয় সরকারে রোগ তত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট।

৯ মার্চ তালেবানের সাথে করা চুক্তির অনুয়ারী আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র।

১০ মার্চ জয় বাংলা জাতীয় শ্লোগান ঘোষণা করে রায় দেন মহামান্য হাইকোর্ট।

১১ মার্চ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণকে বৈশ্বিক মহামারি ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)।

১২ মার্চ দেশের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে উদ্বোধন করা হয়।

১৭ মার্চ ক্ষণগণনা অনুযায়ী মুজিব শতবর্ষ উদ্বোধন করা হয়।

১৭ মার্চ প্রথম করের মতো ২০০ টাকার ব্যাংক নোট বাজারে বসে।

২৩ মার্চ উচ্চ আদালতের নির্দেশে COVI-১৯কে সংক্রমক ব্যাধির তালিকায় যুক্ত করে ১৯ মার্চ ২০২০ জারিকৃত গেজেটে প্রকাশ করে সরকার।

২৬ মার্চ ৫০ তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালন করা হয়।

এপ্রিল

১ এপ্রিল ভারতের কাশমীরের স্থায়ী বাসিন্দার সময়তা পরিবর্তন করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় সরকার।

২ এপ্রিল করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং বহুপাক্ষিকতায় আহবান সংবলিত প্রস্তাব অনুমোদন করে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ।

৪ এপ্রিল করোনা মোকাবিলায় বাংলাদেশের জন্য সহজ শর্তে ৮৫০ কোটি টাকার ঋণ অনুমোদন দেয় বিশ্বব্যাংক।

৫ এপ্রিল করোনা ভাইরাস মহামারিতে ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় ও দেশে অর্থনৈতিক প্রভাব উত্তরে ৭২,৭৫০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রী ।

৬ এপ্রিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মস্বীকৃত খুনি মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ক্যাপ্টেন (বরখাস্ত) আব্দুল মাজেদের ফাঁসি কার্যকর হয়।

কৃষি ক্ষেত্রে সাফল্য ধরে রাখতে ১২ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় কৃষি খাতের জন্য ৫,০০০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন।

১৩ এপ্রিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন।

১৯ এপ্রিল করোনা ভাইরাস সংক্রামণে বাংলাদেশকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

২৮ এপ্রিল জাতীয় অধ্যাপক ও প্রকৌশলী জামিনুর রেজা চৌধুরী মারা যান।

২৯ এপ্রিল ১,৬৩৩ টি স্কুল কলেজ এমপিওভুক্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি।

আমরা হারিয়েছি জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান

মে

৩ মে প্রথম বছরের মতো রোহিঙ্গাদের একটি দলকে নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার ভাসানচরে স্থানান্তর করা হয়।

১৬ মে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ব্যারিস্টার শেখ ফাজলে নূর তাপস।

২০ মে ভারত ও বাংলাদেশের উপকূলে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের সৃষ্টি প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড় আম্পান আঘাত হানে।

২৫ মে যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতাঙ্গ পুলিশের হাতে কৃষাঙ্গ যুবক জজ ফ্লয়েড নির্মমভাবে নিহত হয়।

২৮ মে লিবিয়ায় মানব পাচারকারীদের গুলিতে ২৬ বাংলাদেশি নিহত হয়।

৩১ মে ২০২০ সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়।

১৪ মে শিক্ষাবিদ, গবেষক, লেখক, ভাষাসংগ্রামী বীর মুক্তিযোদ্ধা, জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান ইহলোক ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহে....রাজেউন)। তার পুরো নাম আবু তৈয়ব মোহম্মদ আনিসুজ্জামান। তিনি ২০১২ সাল থেকে আমৃত্যু বাংলা একাডেমির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একাধারে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার একুশে পদক, স্বাধীনতা পুরস্কার সহ দেশ বিদেশের আনেক পুরস্কার ও সম্মান লাভ করেন।

জুন

১ জুন বেতন গ্রেড ১৩-২০ পর্যন্ত পদে সরকারি কর্মচারী নিয়োগের কর্তৃপক্ষ ও পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রস্তাবটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক সুপারিশ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বর্ণিত ও কমিটি গঠিত সংক্রান্ত গেজেট জারি।

২ জুন বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রথমবারের মতো ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভা।

১০ জুন বাংলাদেশে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (CTD) ডি.এন.এ ল্যাবরেটরির নাম পরিবর্তন করে ডি.এন.এ ব্যাংক নামে কার্যক্রম শুরু করে।

১১ জুন জতীয় সংসদে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট পেশ করা হয়।

১৮ জুন বাংলাদেশে নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ বানৌজা সংগ্রাম এর কমিশনিং করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

২৬ জুন যুক্তরাষ্ট্রের মহাদেশ বাহিনী তাদের প্রথম জাতীয় নিরাপত্তা মিশন চালু করে।

২৯ জুন জাতীয় সংসদে পাস হয়ে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের অর্থ বিল।

৩০ জুন জাতীয় সংসদে পাস হয় ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট।

জুলাই

১ জুলাই বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনের (বিজিএমসি) নিয়ন্ত্রণাধীন ২৬ টি রাষ্ট্রয়াত্ত পাটকল বন্ধ করে দেওয়া হয়।

২ জুলাই বিশ্বের ১১ তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিস্কারের ঘোষণা দেয় স্থানীয় প্রতিষ্ঠান গ্লোব বায়োটেক লিমিটেড।

৭ জুলাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সদস্য পদ ত্যাগের জন্য জাতিসংঘ মহাসচিবকে আনুষ্ঠানিকভাবে নোটিশ দেয় যুক্তরাষ্ট্র।

১০ জুলাই তুরস্কের শীর্ষ প্রশাসনিক আদালত ইস্তানবুলের বিশ্বখ্যাত আয়া সোফিয়া জাদুঘরের মর্যাদা নাকচ করার পর এ স্থাপনাকে মসজিদ হিসেবে

মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত বলে ঘোষণা দেন দেশটির প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েফ এরদোয়ান।

১৩ জুলাই বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে প্রথমবারের মতো ভার্চুয়ালি মামলার শুনানি শুরু হয়।

২০ জুলাই Warrant of precdeence ১৯৯৬ এ পরিবর্তন এনে আদেশ জারি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

২১ জুলাই বাংলাদেশ ভারত নৌ-ট্রানজিটের আওতায় ভারতীয় পণ্যের প্রথম চালান নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছে ভারতের জাহাজ এমভি সেজুঁতি।

২৭ জুলাই মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে টিএএন ল্যাবরেটরী ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়।

আগস্ট

১ আগস্ট আরববিশ্বের প্রথম বাণিজ্যিক পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করে সংযুক্ত আরব আমিরাত।

৬ আগস্ট বিশ্বের বৃহত্তম মিথানল উৎপাদন কারখানা চালু করে ইরান।

১২ আগস্ট জাপানের সাথে বাংলাদেশের ৪১ তম অফিসিয়াল ডেভেলপমেন্ট এসিস্ট্যান্স (ওডিএ) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী পালিত হয়।

১৬ আগস্ট সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইসরাইলের মধ্যে সরাসরি ফোন লাইন চালুর মাধ্যমে দু'দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক শুরু হয়।

২১ আগস্ট ইস্তানবুলের 'কারিয়ে যাদুঘর' কে মসজিদে রূপান্তরের আদেশ জারি করেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেফ তায়েপ এর্দোয়ান।

সেপ্টেম্বর

১ সেপ্টেম্বর অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালার সংশোধন করে স্বতন্ত্র অনলাইন নিউজ পোর্টালের পাশাপাশি টেলিভিশন বেতার ও ছাপা পত্রিকাগুলোর অনলাইন সংস্করণ এবং আইপি টিভি ও ইন্টারনেট রেডিও চালনার ক্ষেত্রেও নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করে সরকার।

২ সেপ্টেম্বর দেশের হিন্দু বিধবারা স্বামীর সব সম্পত্তিতে ভাগ পাবেন– এ মর্মে মহামান্য হাইকোর্ট ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেন।

১৬ সেপ্টেম্বর নারী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রথম বারের মত দু'টি ডিজিটাল কলেজ চালু করে সৌদি সরকার।

১৭ সেপ্টেম্বর সন্তানের জাতীয় পরিচয়পত্রে বাবার পাশে মায়ের নাম যুক্ত করা সংক্রান্ত আইনের সংশোধনীতে স্বাক্ষর করে আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট আশ্রাফ ঘানি।

১৮ সেপ্টেম্বর আল্লামা আহমদ শফী ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে.... রাজেউন)। তিনি হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

২২ সেপ্টেম্বর ইতিহাসের অনন্য দিন। এ দিন ইতিহাসে প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ ভার্চুয়াল বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা।

৭ সেপ্টেম্বর করোনা সংক্রমণের কারণে ২০২০ সালের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের এইচ.এস.সি ও সমমানের পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

আমরা হারিয়েছি প্রখ্যাত আলেম আল্লামা আহমদ শফি (র)

অক্টোবর

৮ অক্টোবর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিশোরগঞ্জ-ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সংযোগকারী 'অল ওয়েদার' বা 'আভুরা' সড়ক উদ্বোধন করেন।

১১ অক্টোবর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্বিশেষে সবাইকে জাতীয় বেতন কাঠামোর ১৩তম গ্রেড প্রদান করতে নির্দেশনা দিয়ে আদেশ জারি করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

১৩ অক্টোবর ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ডের বিধান সংযোজন করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) অধ্যাদেশ-২০২০ জারি করা হয়। এদিন প্রখ্যাত লেখক, কথাশিল্পী, মুক্তিযুদ্ধ গবেষক জিয়া হায়দার পরলোক গমন করেন।

নভেম্বর

৩ নভেম্বর ইসরাইলী দখলকৃত ফিলিস্তিন শহর জেরুজালেমে আফ্রিকার প্রথম দেশ হিসেবে দূতাবাস খোলার ঘোষণা দেয় মালাবি।

৮ নভেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু। একই সাথে এটা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত বিশেষ অধিবেশন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন বিশেষ অধিবেশন এই প্রথম।

১৫ নভেম্বর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উত্থাপন করা সাধারণ প্রস্তাব জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত।

২৯ নভেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু রেল সেতুর আনুষ্ঠানিক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

ডিসেম্বর

২ ডিসেম্বর বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে যুক্তরাজ্য প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাস-১৯ মোকাবেলায় ফাইজার বায়োএনটেকের টিকা ব্যবহারের অনুমোদন দেয়।

৩ ডিসেম্বর দিনাজপুরের পার্বতীপুরে ভারত-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন প্রকল্পের কাজের উদ্বোধন করা হয়।

৯ ডিসেম্বর ফ্রান্সে মুসলিম বিরোধী একটি খসড়া আইনের অনুমোদন দেয় দেশটির প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর মন্ত্রিসভা।

১১ ডিসেম্বর ইউনেস্কোর নির্বাহী বোর্ডের ২১০তম সভায় প্রথম বৈঠকে 'ইউনেস্কো-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ ইন দ্যা ফিল্ড অব ক্রিয়েটিভ ইকোনমি' শীর্ষক পুরস্কার প্রবর্তনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৬ ডিসেম্বর ৫০ তম মহান বিজয় দিবস পালিত হয়।

১৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে ভার্চুয়াল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

সালতামামি ২০২০ স্মৃতির আয়নায় চিরকাল ভাস্মর হয়ে থাকবে। মানব সভ্যতার সাথে সমান্তরাল এগিয়ে যাবে ২০২০ সালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। পদ্মা সেতুসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে। শেখ হাসিনার সরকার মুক্তিযুদ্ধের আদর্শভিত্তিক সোনার বাংলা নির্মাণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন দুধে-ভাতে, সুখে-শান্তিতে মানুষ থাকবে-ইনশা আল্লাহ্।♦

আ | ন্ত | র্জা | তি | ক |

জাস্টিন প্যারোট

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর মাঝে

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব-প্রসঙ্গ

মূল : জাস্টিন প্যারোট

অনুবাদ : মুস্তাফা মাসুদ

অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও কৌতূহলোদ্দীপক এই প্রবন্ধটির লেখক নওমুসলিম জাস্টিন প্যারোট। ইসলামের শাশ্বত শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ২০০৪ সালে বিশ বছর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম হয় আবু আমিনা ইলিয়াস; যদিও লেখক হিসেবে জাস্টিন প্যারোটই অব্যাহত রেখেছেন। পদার্থবিজ্ঞান ও ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক এবং ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক স্টাডিজে মাস্টার ডিগ্রিধারী জাস্টিন বর্তমানে আবুধাবির নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে মিড্‌ল ইস্ট স্টাডিজ বিষয়ে রিসার্চ লাইব্রেরিয়ান। বর্তমান প্রবন্ধটি লেখকের `The Case for Allah's Existence in the Quran and Sunnah'-এর অনুবাদ; ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

উল্লেখ্য, যারা বিশ্বাসী, তাদের কাছে আল্লাহর অস্তিত্বের বিষয়টি নিরঙ্কুশ সত্য-অনুভব; সেখানে যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপনের কোনো প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু

অন্যদের সামনে মহান আল্লাহর অস্তিত্বের প্রসঙ্গটি তোলা যেতে পারে এই কারণে যে, এটি যুক্তিপ্রমাণসিদ্ধ; এবং মহান আল্লাহ অবিনশ্বর এক কুদরতি সত্তায় চিরবিরাজমান। এমনকি বিশ্বাসীদের কাছেও এধরনের যুক্তিসিদ্ধ আলোচনার ফলপ্রসূতা আছে; তাতে তাদের ঈমানের ভিত অধিকতর মজবুত হওয়ার সাথে সাথে জ্ঞান-অভিজ্ঞতার পরিসরও বাড়ে।

এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত পবিত্র কুরআনের আয়াতের ইংরেজি অনুবাদের বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন অনূদিত ও প্রকাশিত 'আল-কুরআনুল করীম'-এর বাংলা অনুবাদ গ্রহণ করা হয়েছে; অবশ্য ভাষা 'সাধু' রীতির পরিবর্তে 'চলিত' রীতিতে পরিবর্তন করা হয়েছে।

'তথ্যসূত্র' অংশটি বাংলায় অনুবাদ করা হলো না একারণে যে, এর মধ্যে অনেক শব্দ/টার্ম আছে– যেগুলো বাংলা বানান ও উচ্চারণে বিপত্তি ঘটার সম্ভাবনা আছে। তদুপরি, অনুসন্ধিৎসু পাঠক/গবেষকগণ রেফারেন্স যাচাই করতে চাইলে বা সংশ্লিষ্ট মূল গ্রন্থটি পড়তে/দেখতে চাইলে সেক্ষেত্রে মূল ইংরেজিটাই তাঁদের জন্য অধিকতর সুবিধাজনক হবে।– অনুবাদক

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আল্লাহর অস্তিত্বের বিষয়টি মু'মিনদের কাছে ঈমানের অংশ হিসেবেই স্বীকৃত। নির্ভুল ও প্রামাণ্য ধর্মীয় অভিজ্ঞতা– যা মুসলিমদের প্রাত্যহিক জীবনে বারবার সত্যায়িত– স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহর উপর বিশ্বাসের অনুভূতিকে দৃঢ় করে। তবে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁর অস্তিত্ববিষয়ক সত্য সম্পর্কে জানা অনেকের জন্যই সহজসাধ্য বিষয় নয়; বিশেষ করে, যে-সামাজিক পরিবেশে ঈমান বা বিশ্বাসকে কুসংস্কার, মনগড়া ভাবনা এমনকি বিপজ্জনক কল্পকথা হিসেবে ঠাট্টা-অবজ্ঞা করা হয়, সেই সমাজ-পরিবেশের লোকদের কাছে তা একান্তই কঠিন।

ইসলামি ঐতিহ্যে আল্লাহর অস্তিত্বের বিষয়টি নিরঙ্কুশভাবে প্রোথিত হয় দুটি কারণে; তা হলো: এর যৌক্তিক মূলসূত্রসমূহ এবং এর উদ্দেশ্য, মর্মবাণী, স্বস্তিদায়ক অনুষঙ্গ ও আমাদের জীবন পরিচালনার শাশ্বত নির্দেশনা। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মানুষের মন ও হৃদয়ে প্রভাববিস্তারকারী সংবেদন সৃষ্টি করে ঈমানকে উজ্জীবিত করে। মানুষের অন্তর্জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজ করে যুক্তি ও কার্যকারণের সাহায্যে এক নিশ্চিত বিশ্বাসের ভুবনে তাকে পৌঁছে দিতে। বিশ্বাসের এই উপলব্ধি বর্তমান বৈজ্ঞানিক ধারণাসমূহ দ্বারা দৃঢ়বদ্ধতাপ্রাপ্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ: সমোদ্ভববাদী (একই মূল থেকে উদ্ভূত মতবাদের অনুসারী) বিজ্ঞানী (cognitive scientist) জাস্টিন ব্যারেট দেখিয়েছেন যে, আল্লাহর ওপর বিশ্বাস– এবং একান্ত মামুলিভাবে বিশ্বাসও– গঠিত ও অর্জিত হয় দুভাবে, তা হলো: ১. অ-কর্ষিত, স্বভাবগত অন্তর্জাত বিশ্বাসসমূহ যা অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি; ২. চিন্তা-গবেষণাজাত, সচেতন বিশ্বাসসমূহ যা চিন্তাভাবনার ফলশ্রুতি।[১] মানুষ

স্বভাবত এ দুটি উৎস থেকে বিশ্বাসের আদল তৈরি করে। অনুরূপভাবে, পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর মাঝে আল্লাহর অস্তিত্বের বিষয়টিও বিশ্বাসের উল্লিখিত দুটি উৎসের সাথেই সম্পর্কিত– সজ্ঞাভিত্তিক হার্দিক আবেদন এবং যৌক্তিক চিন্তাভাবনাভিত্তিক মনোগত আবেদন।

মানুষের মাঝে স্রষ্টার অস্তিত্বের বিষয়ে সহজাত বোধ জন্মে একান্তভাবেই অন্তর্গত বিশুদ্ধ সজ্ঞা দ্বারা– চাই সে ধর্মীয় নির্দেশনা লাভ করুক বা না-করুক। এই বিষয়টি বিশ্বের সব ধর্ম ও সংস্কৃতিতেই দেখা যায়। ইসলামি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে এর কারণ হলো: পৃথিবী সৃষ্টিরও আগে স্রষ্টা প্রত্যেকের কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, তারা তাদের স্রষ্টার আনুগত্য স্বীকার করবে। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন: ''স্মরণ করো, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ থেকে তার বংশধরকে বের করেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' তারা বলে, 'হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা সাক্ষী রইলাম।' এটা এজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, 'আমরা তো এ বিষয়ে গাফিল ছিলাম'।''[২]

সপ্তম-অষ্টম শতকের খ্যাতনামা ইসলামি পণ্ডিত আল-সুদ্দি (র) [ইন্তিকাল: ৭৪৫] মন্তব্য করেছেন, ''এ কারণে, পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে জানে না যে তার প্রতিপালক আল্লাহ এবং কেউ প্রতিমার সাথে আল্লাহকে সংশ্লিষ্ট করে না এ কথা বলা ব্যতীত যে–: 'আমি আমার পূর্বপুরুষদেরকে অন্য ধর্ম অনুসরণ করতে দেখেছি'।''[৩] পূর্বকৃত অঙ্গীকারের কারণে মানুষের ভেতর এক সহজাত তাড়নার সৃষ্টি হয় উচ্চতর কোনো শক্তির সন্ধানে, যা তারা অনুভব করতে পারে; এই দৃষ্টিতে আধুনিক কিছু বিজ্ঞানী যুক্তি দেখান যে– আল্লাহ বা স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস আমাদের জিনের মর্মমূলে প্রোথিত।[৪]

সত্য ও প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত সকল ধর্মই মানব-স্বভাবের প্রতি দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেছে যা স্রষ্টা আমাদের ভেতরে সঞ্চারিত করেছেন। পবিত্র কুরআন মানুষের ধর্মীয় প্রকৃতিকে 'ফিতরাত আল্লাহ'– সহজাত ও অন্তর্গত প্রকৃতি বলে অভিহিত করেছে, যে প্রকৃতি অনুযায়ী আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন: ''অতএব তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দীনে প্রতিষ্ঠিত করো। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ করো, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।[৫]

সব মানুষ জন্মগ্রহণ করেছিল আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী হিসেবে, এবং নবী-রাসূলগণের প্রতি নাজিলকৃত ওহী স্রেফ সেই প্রবণতাকে জাগ্রত ও বেগবান করে, যা ইতোমধ্যে আমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে। এমনকি

বহুঈশ্বরবাদী, যারা বহু দেবদেবীতে বিশ্বাসী, তারাও সচরাচর বিশ্বাস করে থাকে যে, তাদের সেইসব দেবদেবীর উপরেও এক উচ্চতর শক্তি, এমনকি এক মহোত্তম 'খোদা' আছে। আল্লাহ বলেন, ''তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন?' তারা নিশ্চয়ই বলবে, 'আল্লাহ।' বলো, 'সকল প্রশংসা আল্লাহরই', কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।''[৬] আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আরও ইরশাদ করেন, ''যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে, তারা অবশ্যই বলবেঃ 'আল্লাহ।' তবুও তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে ?''[৭]

মানুষ যখন বিপদে পতিত হয়, তখন তারা এক উচ্চতর শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করে এবং তারা তখন স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। প্রতিটি নরনারী তাদের জীবনে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এমন গুরুতর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়, যার জন্য তাদের মধ্যে বিশেষ তাড়না সৃষ্টি হয় নামাজের শান্তিময় কোলে আশ্রয় নিতে। এমন বহু মানুষের ঘটনা আছে যে– কারও মৃত্যুর আকস্মিক ঘটনায় তাড়িত হয়ে তাদের নিজেদের ধর্মবিশ্বাস অধিকতর দৃঢ় হয়। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন, ''তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন তারা বিশুদ্ধচিত্তে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখন তারা শির্‌কে লিপ্ত হয়।''[৮] অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, ''বলো, কে তোমাদের ত্রাণ করে স্থলভাগের ও সমুদ্রের অন্ধকার হতে যখন তোমরা কাতরভাবে এবং গোপনে তার কাছে অনুনয় কর? 'আমাদেরকে তা থেকে ত্রাণ করলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।' বলো, 'আল্লাহই তোমাদেরকে তা থেকে এবং সমস্ত দুঃখ-কষ্ট থেকে ত্রাণ করেন। এতদসত্ত্বেও তোমরা তাঁর শরিক কর।''[৯] আল্লাহ বলেন, ''মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন তারা বিশুদ্ধচিত্তে তাদের প্রতিপালককে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ আস্বাদন করান তখন তাদের একদল তাদের প্রতিপালকের শরিক করে থাকে; ফলে তাদেরকে আমি যা দিয়েছি, তারা তা অস্বীকার করে। সুতরাং ভোগ করে নাও, সত্বর তোমরা জানতে পারবে।''[১০] ইরশাদ হচ্ছে, ''মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে একনিষ্ঠভাবে তার প্রতিপালককে ডাকে। পরে যখন তিনি তার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন সে বিস্মৃত হয়ে যায় তার আগে যার জন্য সে ডেকেছিল তাঁকে এবং সে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করায়, অপরকে তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত করবার জন্য।''[১১]

ইমাম গাজালি (র) [ইন্তিকালঃ ১১১১ খ্রি.] সহজাত ধর্মীয় প্রবণতাকে নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে 'বস্তুসমূহের বাস্তবতার জ্ঞান অনুসন্ধানের জন্য' জনগণের প্রতি আবেদন হিসেবে তাঁর আত্মজীবনীতে বর্ণনা করেছেন।[১২] সত্যের জন্য এই

আত্মিক আকাঙ্ক্ষাকে তিনি 'তৃষ্ণা' হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যাকে অবশ্যই নিবারণ করতে হবে। এটি হলো হৃদয়ে রিক্ততা ও শূন্যতার অবস্থা, নিজ অস্তিত্বের সঙ্গে একধরনের টানাপড়েন; জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য আবিষ্কার করেই এই রিক্ততা-শূন্যতা পূর্ণ করতে হবে। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস অর্জনের ক্ষেত্রে যুক্তি যেখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, সেখানে এটি এখনও আধ্যাত্মিকতার পথে স্রেফ একটি পদক্ষেপ: ''যুক্তি-সীমার বাইরেও একটি স্তর আছে, যা ভিন্নতর এক দৃষ্টি খুলে দেয়; যা দ্বারা কেউ অদেখাকে এবং ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা দেখার অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে।''[১৩]

আল্লাহ-সম্পর্কিত জ্ঞান প্রাথমিকভাবে হৃদয়ে অবস্থান করে এবং তা যুক্তি দ্বারা অধিকতর শক্তিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু তা কেবল যুক্তি দ্বারা অর্জিত ও সংহত হয় না; সেখানে অবশ্যই থাকবে: নির্ভেজাল ধর্মীয় অভিজ্ঞতা, বৃহত্তর উদ্দেশ্যের স্বীকৃতি ও অসীম বিশ্বজগতের তাৎপর্য, এবং আধ্যাত্মিক অমৃতফলের আস্বাদ। একারণে ইসলামের প্রথম যুগের পণ্ডিতেরা আল্লাহ-সম্পর্কিত জ্ঞানকে ঘটনা ও যুক্তির সংকলন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেননি; বরং হৃদয়স্থ আলো হিসেবে অভিহিত করেছেন। ইমাম মালিক (র) [ইন্তিকাল:৭৯৫] বলেন, ''অনেক প্রবাদ-কথামালা জানাই জ্ঞান নয়; বস্তুত জ্ঞান হলো স্রেফ একটি আলো, যা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মানুষের হৃদয়ে সংস্থাপিত করেছেন।[১৪] ইবনে রজব (র) [ইন্তিকাল:১৩৯৩] বলেন, ''বহু বর্ণনা ও প্রবাদপ্রবচন মুখস্থ করাই জ্ঞান নয়; বরং তা হলো এমন এক আলো যা আল্লাহ আমাদের হৃদয়ে জ্বেলে দিয়েছেন, যার সাহায্যে বান্দা সত্য উপলব্ধি করে এবং একে (সত্যকে) অসত্য থেকে আলাদা করতে সক্ষম হয়।''[১৫]

শান্তি ও পরিতৃপ্তির অনুভব

আল্লাহ-সম্পর্কিত জ্ঞানের আলো আমরা দেখতে পাই পথনির্দেশনা, আধ্যাত্মিক গতিপথ এবং শান্তির বোধের মধ্যে যা বিশ্বাসীরা অর্জন করে ইসলাম চর্চার দ্বারা; তা আমাদের সবার আধ্যাত্মিক শূন্যতা পূরণ করতে পারে। তবে আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর সর্বময় কর্তৃত্বের সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ ক্বালবের অভ্যন্তরীণ অনুভবের মধ্যে পাওয়া যায়, যার মাধ্যমে বিশ্বাসীরা খুঁজে পায় পরিতৃপ্তি, আত্মিক শান্তি, নৈতিক শিক্ষা এবং জীবনের অর্থময়তা– প্রকৃত ধর্মের আধ্যাত্মিক অমৃতফল। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন, ''আল্লাহর নিকট থেকে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট এসেছে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, এ দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর পথে নিয়ে যান এবং তাদেরকে সরলপথে পরিচালিত করেন।''[১৬]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে: ''হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে দেবেন দ্বিগুণ পুরস্কার এবং তিনি তোমাদেরকে দেবেন, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।''[১৭] আল্লাহ বলেন, ''জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।''[১৮] পবিত্র কুরআন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে: যারা ঈমানদার তারা 'সুখময় জীবন' যাপন করবে এবং পরজীবনে তারা নিরতিশয় মহোত্তর সত্তায় পরিবর্তিত হবে। বিশ্বাসীরা ইহজীবনে যে শান্তির আস্বাদ লাভ করে, তা আখিরাতের জীবনের অনন্ত শান্তির সামান্য আস্বাদমাত্র। এই সত্যের উপর আলো প্রতিফলিত হয়ে দিনের পর দিন সালাতে এক অনির্বচনীয় প্রশান্তি লাভ হয়। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন, ''মু'মিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।''[১৯] অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে: ''হে প্রশান্তচিত্ত! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে, আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও, আর আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।''[২০] এটি এমন কোনো প্রতিশ্রুতি নয় যে, বিশ্বাসীরা কখনই দুঃখ-দুর্দশার স্বাদ ভোগ করবে না; বরং আল্লাহ নিশ্চিত করে বলছেন– এমন সময় আসবে যখন বিশ্বাসীদেরকে তাদের ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের জন্য পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে। এতদসত্ত্বেও, আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, বিশ্বাসীরা তাদের আত্মিক অনুশীলন এবং নৈতিক ও ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষার মাধ্যমে জীবনে সুস্থিত পরিতৃপ্তি ও সন্তুষ্টি লাভ করবে। আল্লাহ বলেন, ''অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করবেন আর তুমি সন্তুষ্ট হবে।''[২১]

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, সেই ব্যক্তি সফলকাম যে ইসলামে দীক্ষা নিয়েছে; যার জীবনোপকরণ যথেষ্ট, এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতেই সে সন্তুষ্ট থাকে।[২২] তিনি আত্মিক সন্তুষ্টিকে 'ঈমানের মিষ্টতা'– সত্য ধর্মের ফল হিসেবে বর্ণনা করেছেন যার স্বাদ ও অভিজ্ঞতা লাভ করা যাবে। এটি পরম সত্যের সাথে মিলন ঘটায়, যা দ্বারা একজন মু'মিন নর/নারী সিজদাবনত হয় ও তার বিশ্বাসে নিঃসংশয় হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেন: সেই ব্যক্তি সত্যের মিষ্টতা আস্বাদন করেছে, যে আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে, ইসলামকে ধর্ম হিসেবে এবং মুহাম্মদ (সা)-কে রাসূল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট।[২৩] প্রামাণ্য ইসলামি গ্রন্থাদিতে সন্তুষ্টিকে সত্তার সুস্থিতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা মু'মিনদেরকে একান্ত ক্ষণস্থায়ী আনন্দ ও দুঃখের মধ্যকার বিভ্রান্তি থেকে হিফাজত করে; এভাবে, জীবনে যা-ই ঘটুক না কেন তারা এক ধরনের তৃপ্তি ও প্রশান্তির মধ্যে থাকতে পারে। পার্থিব ধনসম্পত্তি ও ক্ষণস্থায়ী উদ্বেগ থেকে এর বিচ্ছিন্নতা

সুস্পষ্ট, এবং দারিদ্র্য-ভীতির সমাপ্তি। বস্তুত, সত্তার আধ্যাত্মিক অবস্থা তাই; রাসূলুল্লাহ (সা) যাকে সত্যিকার সম্পদ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: অঢেল ধনসম্পত্তিই প্রকৃত সম্পদ নয়; বরং প্রকৃত সম্পদ হলো আত্মার ঐশ্বর্য।[২৪] রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেছেন: সম্পদ অন্তরে এবং দারিদ্র্যও অন্তরে। যে কেউ অন্তরে ধনী, পৃথিবীতে যা-ই ঘটুক না কেন, সে-অন্তরের কোনো ক্ষতি হবে না। যে কেউ অন্তরে দরিদ্র, পৃথিবীতে যত কিছুই সে লাভ করুক না কেন, সে সন্তুষ্ট হবে না। বস্তুত, সে কেবল তার নিজের আত্মার লোভের দ্বারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[২৫] ফলস্বরূপ, যারা তাদের মৌলিক পার্থিব চাহিদা মেটানোসহ এই সত্তার অধিকারী হবে তারাই পৃথিবীতে সবচেয়ে সম্পদশালী ব্যক্তি।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: যখন তোমাদের মধ্যে কারো ঘুম ভাঙে সম্পদের নিরাপদ অবস্থায়, শারীরিক সুস্থ অবস্থায় এবং দিনের আহারের সংস্থান থাকা অবস্থায়, তাকে যেন পুরো পৃথিবীটাই দিয়ে দেওয়া হয়েছে।[২৬] সম্পদ, বিত্তবিভব এবং পার্থিব প্রতাপপ্রতিপত্তি যখন লোকদেরকে গ্রাস করে ফেলে, অবধারিতভাবে তারা নিজেদের মধ্যে একধরনের শূন্যতা অনুভব করবে; তাদের যতকিছুই থাকুক না কেন, দুঃখ তাদের তাড়িয়ে বেড়াবে। প্রাথমিক যুগের মুসলমানেরা বলতেন: ''পৃথিবীর রাজা ও তার সন্তানেরা যদি জানতেন যে– কী অনুগ্রহ আর সুখের অধিকারী আমরা, তাহলে তারা অস্ত্রহাতে আমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতো।[২৭] খাঁটি এবং সুস্থিত সুখ এমন কিছু নয় যা আমরা অস্বাভাবিকভাবে অর্জন করি– যেমনটা রাজাবাদশাহ ও শক্তিমান নেতারা কল্পনা করতে পারতেন। বস্তুগত পৃথিবী দীর্ঘকাল আমাদের সুখী ও পরিতৃপ্ত করতে পারে না; মহান স্রষ্টার সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে অন্তরের মধ্যেই আমাদেরকে সুখের উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। এটা হলো সবার জন্য ইসলামের বিনামূল্যে উপহার।

পরিতৃপ্তির এই অবস্থায় ঈমানদার ব্যক্তিগণ জীবনের অবশ্যম্ভাবী দুঃখকষ্ট সহ্য করার ক্ষেত্রে অধিকতর সক্ষম থাকে। মুনাফিকেরা– যারা স্ববিরোধিতাসহ তাদের ধর্মে নিষ্ঠাহীন, তারা অনুরূপ সুস্থিতি ও তৃপ্তি-সহকারে দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে পারে না। নবী করীম (সা) বলেছেন: ঈমানদারদের দৃষ্টান্ত এমন এক শস্যের, যা বাতাসের ঝাপটাকে ঠেকিয়ে রাখে, যার ফলে ঈমানদারগণ অব্যাহতভাবে পার্থিব প্রতিকূলতাকে প্রতিহত করে। (পক্ষান্তরে,) মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত এক দৃঢ়মূল পাইন বৃক্ষ; ফলে এটি সমূলে উৎপাটিত না হওয়া পর্যন্ত সামান্য নড়ে না।[২৮] এই আধ্যাত্মিক অমৃতফলসমূহের স্বাদ গ্রহণ করে প্রতিটি ইতিবাচক ও অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞতার দ্বারা বিশ্বাসীরা তাদের ঈমানকে পোক্ত করে। যুক্তিগ্রাহ্য অথবা দার্শনিক বিতর্কের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতার চেয়ে আল্লাহ-

সম্পর্কিত জ্ঞান-অভিজ্ঞতা অধিকতর কার্যকরভাবে সংহত হয় এসব আধ্যাত্মিক জ্ঞান-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।

ইমাম গাজালি (র) লিখেছেন: যখন থেকে আপনি নবুওয়াতের অর্থ উপলব্ধি করেছেন এবং কুরআন ও সনাতন বিষয়াবলি ব্যাপকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, তখন থেকে আপনি অবশ্যম্ভাবীভাবে এমন এক জ্ঞানের স্তরে পৌঁছে যাবেন, যা (মুহাম্মদ সা) নবুয়াতের শ্রেষ্ঠতম পর্যায়ের প্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং তা শক্তি লাভ করেছে তাঁর শিক্ষার দ্বারা– আল্লাহর ইবাদত ও ক্বালবের পরিশুদ্ধির মাধ্যমে।... এভাবে আপনি যখন এক হাজারবার, দু হাজারবার এবং অনেক হাজারবার সেই অভিজ্ঞতা লাভ করবেন, তখন আপনি অবশ্যম্ভাবীভাবে এমন জ্ঞান অর্জন করবেন, যা সন্দেহাতীত।[২৯]

সমোদ্ভববাদী বিজ্ঞানিগণ (cognitive scientists) যেমনটি দেখিয়েছেন– বিশ্বাসকে মজবুত করার সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতির পেছনে যে কারণটি তা হলো– ধর্মীয় অভিজ্ঞতারাজির গভীরতার কারণেই তারা বিস্মৃতিপ্রবণ হয় না।[৩০] বিশ্বাসী পুরুষ বা নারী তাদের জীবনে– দিনের পর দিন যে আধ্যাত্মিক অনুশীলনের সুফল প্রত্যক্ষ করেছে, তাতে তারা এমন এক নিশ্চয়তা ও পরিতৃপ্তির স্তরে উপনীত হবে, যা তারা কখনো পরিত্যাগ করার কথা চিন্তাও করবে না।

এক ভ্রষ্ট প্রবৃত্তি

সকলেই তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে নির্ভুল ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করে না বা তা বোঝে না। মানব-প্রবৃত্তি ভ্রান্ত মত ও দর্শনের দ্বারা পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে নিরাপদ নয়; ওই ভ্রান্ত মত ও দর্শন আমাদের সজীব প্রবৃত্তিকে, এমনকি আস্তিকতার ভিত্তি হিসেবে দাবিদার ভাবনাচিন্তাগুলোকে স্ববিরোধিতার মুখে ফেলে দেয়। নবী করীম (সা) বলেছেন: প্রত্যেকেই স্বভাবগত প্রবৃত্তি বা ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে । অতঃপর তার মাতাপিতা তাকে ইহুদি, খ্রিষ্টান অথবা অগ্নিউপাসকে পরিবর্তিত করে। জীব হিসেবে তাদের বাচ্চাদের জন্ম হয় নিখুঁত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সহকারে, তুমি কী সেখানে কোনোকিছু ত্রুটিযুক্ত দেখতে পাও ?[৩১] এই হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে বলছেন যে– এক অদ্বিতীয়, সর্বশক্তিমান ও দয়াময় স্রষ্টার সহজ, স্বাভাবিক উপাসনাকে স্বীকার করে নিতেই প্রত্যেকে জন্মগ্রহণ করে। যাহোক, বিভিন্ন কারণে মানুষেরা ধর্মীয় মতবাদসমূহ উদ্ভাবন করে, যা আল্লাহর প্রতি মানবত্ব আরোপ করে, কিংবা সৃষ্ট প্রাণীতে দৈব গুণাবলি আরোপ করে (যেমনটা করা হয় সাধুসন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে), কিংবা সর্বাংশে তারা স্রষ্টাকে অস্বীকার করে।

যখন মানব-প্রকৃতি এবং এক আল্লাহর প্রতি অন্তর্জাত বিশ্বাস কলুষিত-নীতিবিবর্জিত হয়ে যায়– সেটা হতে পারে নেতিবাচক জ্ঞান-অভিজ্ঞতা কিংবা

অন্যদের প্রভাবের দ্বারা– তখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে একজন মানুষের জন্য যৌক্তিক বিতর্কের প্রয়োজন হতে পারে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (মৃত্যু: ১৩২৮) লিখেছেন: স্রষ্টার স্থিতি ও স্বীকৃতির বিষয়টি মানব-প্রকৃতিতে এক মৌলিক সহজাত প্রবর্তনা; এমনকি, যদিও কিছু লোক তাদের প্রবৃত্তিকে নীতিবিবর্জিত করে ফেলেছে– তা এমন যে, আল্লাহ-সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের জন্য তাদের যুক্তিতর্কের প্রয়োজন পড়ে। অধিকাংশ সাধারণ মানুষের এবং নিপুণ বিতার্কিকদেরও অভিমত এই যে, আল্লাহ-সম্পর্কিত জ্ঞান কখনো কখনো চেষ্টা ব্যতীতই আর্জিত হয়; আবার কখনো কখনো অর্জিত হয় যুক্তিতর্ক-বাদানুবাদের দ্বারা, যখন তা একাধিক ধর্মতত্ত্ববিশেষজ্ঞ দ্বারা অনুমোদিত হয়।[৩২]

আমাদের অন্তর্জাত বিশ্বাসসমূহ, যা আমরা লাভ করি প্রকৃতিগত প্রবণতা ও অভিজ্ঞতা থেকে, তা আমাদের বিস্তৃততর বিশ্বাসসমূহকে দৃঢ়বদ্ধ ও অবহিতকরণে কাজ করে; যা আমরা অর্জন করি চিন্তা-গবেষণা ও সচেতন, যৌক্তিক বিচারবিবেচনার মাধ্যমে।[৩৩] এই পন্থায়, কুরআন অধ্যয়ন ও তা নিয়ে গবেষণা মন ও কার্যকারণের শক্তির উপর সংবেদন সৃষ্টির মাধ্যমে ক্বালবের অন্তর্জাত জ্ঞানের ভিত্তি নির্মাণ করে।

মন, কার্যকারণ ও যুক্তির প্রতি আবেদন: মহাবিশ্বতত্ত্ব সংক্রান্ত আলোচনা

পরিণামে বেশিরভাগ মানুষই জ্ঞান-অভিজ্ঞতার প্রকৃতি সম্বন্ধে নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করে: আমি কেন এখানে এলাম? কেন এই পৃথিবী ও বিশ্বজগতের সৃষ্টি? এখানে কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে কেন এবং এখানে কিছু নেই– এমনটা কেন হয়নি? পবিত্র কুরআন এ প্রশ্নের জবাব তুলে ধরেছে মহাবিশ্ব সংক্রান্ত আলোচনার সাহায্যে– স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, মহান আল্লাহই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তা অস্তিত্ববান রেখেছেন। মানুষদেরকে তাদের অস্তিত্বের প্রকৃতি ও মহাবিশ্ব সম্পর্কে অভিনিবেশ-সহকারে চিন্তাভাবনা করতে বলা হয়। এটা কী বাস্তবিকপক্ষে বিশ্বাসযোগ্য, কাণ্ডজ্ঞানসম্মত এবং সজ্ঞাজাত যে, মহাবিশ্ব কোনো কারণ ছাড়াই ইচ্ছামতো সৃষ্টি হয়েছে? আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন, ''তারা কী নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখে না? আল্লাহ আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাদের অন্তর্বর্তী সমস্তকিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এবং এক নির্দিষ্ট কালের জন্য। কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকেই তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাতে অবিশ্বাসী।''[৩৪]

আমাদের সহজাত বোধ এবং অভিজ্ঞতা আমাদেরকে বলে যে, সব ফলাফলেরই কারণ থাকে; বস্তুসমূহের সৃষ্টি হয় অস্তিত্ববান হওয়ার জন্য; কারণ, কোনোকিছু তাদেরকে ওই প্রক্রিয়ায় বানিয়েছে। যেহেতু মহাবিশ্ব কারণ ও ফলাফলের এক সুবিশাল পরম্পরা, তাই যৌক্তিকভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত

হওয়া যায় যে, এর একটি আসল কার্যকারণ ছিল, যা সবকিছুকে সক্রিয় রাখে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন: ''তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? না কি তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে?''[৩৫] আয়াতসমূহের মধ্যে তিনটি প্রস্তাবনার উল্লেখ রয়েছে: ১. মহাবিশ্ব কোনো প্রতিভূ ছাড়াই অস্তিত্বে এসেছে; ২. মানুষেরাই নিজেদেরকে সৃষ্টি করেছে; ৩. মহাবিশ্বকে অবশ্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রথম দুটি প্রস্তাবনা অসম্ভব। এটি কোনো বিষয়ই হতে পারে না যে– মহাবিশ্ব কোনো কারণ, উদ্দেশ্য, অথবা এতে সঞ্চারিত কোনো শক্তি ও দিকনির্দেশনা ছাড়াই এবং কোনো স্রষ্টা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানতে পারি যে, জীবনে আমরা যা-কিছুই প্রত্যক্ষ করি, প্রতিটি ফলাফল যা আমরা দেখি, অবস্থাবিশেষে অবশ্যই তার ব্যাখ্যা রয়েছে। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয়– মানুষ নিজেরাই নিজেদেরকে সৃষ্টি করেছে– একবাক্যেই নাকচ করা যেতে পারে। সুতরাং একমাত্র যৌক্তিক উপসংহার এই যে, বিশ্বজগৎ এক মহাঘটনার ফলশ্রুতি– এটিকে সৃষ্টি করা হয়েছিল– এটি টিকে থাকার জন্য তৈরি হয়েছিল এমন কিছু দ্বারা, যা এর চেয়ে মহোত্তর ও অধিক শক্তিমান।

ইবনে হাজার (র) [ইন্তিকাল: ১৩৫০] উক্ত আয়াতসমূহের অর্থের ব্যাখ্যা দিয়েছেন আল্লামা আল-খাত্তাবীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে: ''আয়াতসমূহের অর্থ এভাবে করা যায়: তারা কী স্রষ্টা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছিল? এটি একেবারেই অসম্ভব; বরং তাদের অবশ্যই একজন স্রষ্টা আছেন। যদি তারা স্রষ্টাকে অস্বীকার করে, তাহলে অবশ্যই তারা নিজেরাই নিজেদেরকে সৃষ্টি করেছে, এবং এ বিষয়টি আরও অধিকতর বোকামি ও অসত্য; কারণ, অস্তিত্বহীন কোনোকিছু কীভাবে কিছু সৃষ্টি করতে পারে? যদি তারা এই দুটি অভিমত (তারা একজন স্রষ্টা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছিল অথবা তারা নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টি করেছিল) না মানে, তাহলে তাদের সামনে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে– বাস্তবিকপক্ষে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছিল।[৩৬] পণ্ডিতগণ উদ্ধৃত আয়াতগুলো এবং অন্যান্য উৎস থেকে বিস্তর চিন্তাভাবনার অনুষঙ্গ খুঁজে পেয়েছেন, যাকে কখনো কখনো মহাবিশ্বতাত্ত্বিক যুক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন; এসব যুক্তির মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে বেরিয়ে আসে যে, কারণবিহীন কারণ বা প্রথম কারণরূপে মহান আল্লাহই অস্তিত্বসংক্রান্ত প্রশ্নের সবচেয়ে যুক্তিসিদ্ধ জবাব। তুর্কি দার্শনিক অধ্যাপক ড. ইসমাইল লতিফ হাশমেবিওগলু নিম্নবর্ণিতভাবে এসব যুক্তির সংক্ষেপায়ন করেছেন–

১. মহাবিশ্বের প্রতিটি জিনিস, যার আরম্ভ আছে তার অবশ্যই একটি কার্যকারণ আছে;

২. অস্তিত্ববান থাকার জন্যই মহাবিশ্বের শুরু;
৩. সুতরাং মহাবিশ্বের স্থিতির শুরু অবশ্যই কারো দ্বারা ঘটেছে;
৪. এমন ঘটনার পেছনে আছেন অবশ্যই এক কারণবিহীন কারণ বা স্বয়ম্ভূ আল্লাহ।[৩৭]

চিন্তার এই ধারাটি মানুষের মনের কাছে গ্রহণযোগ্য, এবং এটি মানুষের সহজাত বোধ ও অভিজ্ঞতার মধ্যে ইতিবাচকভাবে উপস্থিত। এর মাধ্যমে কেন সবকিছু আদি স্থানে বিদ্যমান থাকে– এই প্রশ্নের পর্যাপ্ত জবাব পাওয়া যায়। জুবাইর ইবনে মুত'ইম (রা) [ইন্তিকাল: ৬৭৭ খ্রি] থেকে বর্ণিত, এক সন্ধ্যায় তিনি (তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি) মাগরিবের নামাজে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করতে শোনেন, এবং তিনি বলেন, ''(তা শুনে) আমার হৃদয় যেন উড়াল দিতে চাইছিল।''[৩৮] আয়াতগুলির মধ্যে এতই তীব্র সম্মোহনকারী যুক্তি ছিল যে, (তাতে আকৃষ্ট হয়ে) জুবাইর ইসলাম গ্রহণ করেন।[৩৯] এই যুক্তির একটি ভাষ্য প্রখ্যাত মুফতি ও ধর্মতত্ত্ববিদ ইমাম আবু হানিফা (র) [ইন্তিকাল: ৭৬৭] দার্শনিকদের সাথে এক বিতর্কের সময় ব্যবহার করেন, যে দার্শনিকেরা ছিলেন আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহপ্রবণ বা নাস্তিক। ইমাম আবু হানিফা (র) থেকে বর্ণিত: একবার কতিপয় দার্শনিক (আহল আল-কালাম) একস্রষ্টার অস্তিত্ব বিষয়ে তাঁর সাথে আলোচনার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। আবু হানিফা (র) তখন তাদেরকে বললেন: ''এ বিষয়ে আলোচনার আগে আপনারা আমাকে একটি জাহাজের বিষয়ে বলুন যেটি তাইগ্রিস নদীতে খাদ্য, মালামাল ও অন্যান্য জিনিসপত্রসহ নিজে নিজেই চলছে; অতঃপর এটি নিজে নিজেই ফিরে এলো; অতঃপর নিজে নিজেই নোঙ্গর করল, তারপর মালামাল খালাস করল এবং কারো কোনোরূপ ব্যবস্থাপনা ব্যতীতই জাহাজটি প্রয়োজনীয় অন্য সব কাজ করা অব্যাহত রাখল।'' দার্শনিকেরা তখন বললেন, ''এমনটি কখনোই ঘটতে পারে না।'' আবু হানিফা (র) তখন বললেন, ''একটি জাহাজের জন্য এটি অসম্ভব, তাহলে এই বিশাল বিশ্বজগতের জন্য (স্রষ্টা বা চালক ব্যতীত) তা কীভাবে সম্ভব?''[৪০] কারো পরিচালনা ছাড়া একটি পানিচালিত যন্ত্রের উৎপাদন, কৃষিজমিতে পানিসেচ এবং চাষাবাদের বিষয়ে অনুরূপ দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন ইবনে আল কাইয়্যিম (র) [ইন্তিকাল: ১৩৫০ খ্রি.]: নদীর উপরে নিখুঁতভাবে ঘূর্ণায়মান একটি পানিচালিত যন্ত্রের বিষয়ে আপনি কী বলবেন? এর মেশিনপত্র সব নিখুঁত, এর যন্ত্রাংশগুলো নির্ভুল মাপের, এবং এটি এমন সুস্পষ্ট যে, কোনো পর্যবেক্ষকই এর যন্ত্রপাতি ও কাঠামোতে কোনো ত্রুটি খুঁজে পাবে না। এটিকে এক বিশাল উদ্যানের সাথে সংযোগ দেওয়া হলো, যে উদ্যানে রয়েছে প্রত্যেক প্রকারের ফল ও শষ্যাদি; সেগুলোর উপর প্রয়োজনমতো

পানিসেচন করা হয়। এই বাগানের মধ্যে ফলমূল-শষ্যাদি জড়ো করা হয় এবং ভালোর জন্য এর রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা হয়। বাগানে ফল-শষ্যাদির উৎপাদন সন্তোষজনক ও উন্নত মানসম্পন্ন, এবং এর সকল আনুষঙ্গিক প্রয়োজনই ভালোভাবে পূরণ করা হয়। সুতরাং, (দেখা যাচ্ছে) এর কিছুই অকেজো ফেলে রাখা হয়নি এবং বাগানের কোনো ফলই পচতে দেওয়া হয়নি। অতঃপর উৎপাদিত প্রতিটি জিনিসের মূল্য ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয় ভোক্তাদের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার মাপকাঠিতে, ভাগ করা হয় প্রতিটির ধরন অনুসারে এবং সেই নিয়মেই সব সময় বিতরণ/সরবরাহ করা হয়। এই আয়োজনের মধ্যে আপনি কী একজন স্রষ্টা কিংবা একজন কৃষক কিংবা একজন ব্যবস্থাপকের বিদ্যমানতা দেখতে পান? অথবা ওই পানিচালিত সেচযন্ত্র ও বাগানের ব্যবস্থাপনাগত আয়োজন কী একজন চালক অথবা একজন রক্ষণাবেক্ষণকারী বা একজন ব্যবস্থাপক ব্যতীতই হয়েছে? ওই বিষয়ে আপনার মন যা বলছে তাতে আপনি কী উপলব্ধি করেন এবং কীভাবে আপনি তা ব্যাখ্যা করবেন?[৪১]

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

তথ্যসূত্র

1. Barrett, Justin L. *Cognitive Science, Religion, and Theology: From Human Minds to Divine Minds*. (West Conshohocken, PA: Templeton Press, 2011), 11.
2. Sūrat al-‘Arāf 7:172.
3. al-Ṭabarī. *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl al-Qur’ān*. Bayrūt: Mu’assasat al-Risālah, 2000), 10:561, verse 7:172.
4. Hamer, Dean H. T*he God Gene: How Faith Is Hardwired into Our Genes*. (New York: Doubleday, 2004), 6.
5. Sūrat al-Rūm 30:30.
6. Sūrat Luqmān 31:25.
7. Sūrat al-Zukhruf 43:87.
8. Sūrat al-‘Ankabūt 29:65.
9. Sūrat al-An’ām 6:63-64.
10. Sūrat al-Rūm 30:33-34.
11. Sūrat al-Zumar 39:8.
12. al-Ghazzālī, ‘Abd al-Ḥalīm. *al-Munqidh min al-Ḍalā*l. al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Ḥadīthah, [1972]), 111.
13. al-Ghazzālī, *al-Munqidh min al-Ḍalāl*, 182.
14. ‘Iyāḍ, [al-Qāḍī] Abū al-Faḍl. *al-Ilmā‘ ilā Ma‘rifat Uṣūl*. al-Qāhirah: Dār at-Turāṯh, [1970]), 217.
15. Ibn Rajab, and Muḥammad N. Ajmaī. *Bayān Faḍl ‘ilm al-Salaf ‘alá ‘ilm al-Khalaf*. (Bayrūt, Lubnān: Dār al-Bashā’ir al-Islāmīyah, 1995), 58.
16. Sūrat al-Mā’idah 5:15-16.

17. Sūrat al-Ḥadīd 57:28.
18. Sūrat al-Ra'd 13:28.
19. Sūrat al-Naḥl 16:97.
20. Sūrat al-Fajr 89:27-30.
21. Sūrat al-Ḍuḥa 93:5.
22. Muslim, Ibn H. *Ṣaḥīḥ Muslim*. ([Bayrūt]: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabīyah, [1955]), 2:730 #1054.
23. Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 1:62 #34.
24. al-Bukhārī, Muḥammad I. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. (Bayrūt: Dār Ṭawq al-Najjāh, [2002]), 8:95. #6446.
25. al-Ṭabarānī, Sulaymān ibn Aḥmad, and Ḥamdī 'Abd al-Majīd Salafī. *al-Mu'jam al-Kabīr*. (al-Qāhirah: Maktabat Ibn Taymīyah, 1994), 2:154 #1643; declared authentic (ṣaḥiḥ) by Al-Albānī in *Ṣaḥīh al-Jāmi' al-Ṣaghīr wa Ziyādatihi* ([Dimashq]: al-Maktab al-Islāmī, 1969), 2:1289 #7816.
26. al-Tirmidhī, Ibn 'Īsá. *Sunan al-Tirmidhī*. (Bayrūt: Dār al-Ġarb al-Islāmī, 1998), 4:152 #2346; declared fair (*ḥasan*) by Al-Tirmidhī in his comments.
27. Ibn 'Asākir. *Tārīkh Dimashq*. (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1995), 6:303.
28. al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* 7:114 #5643.
29. al-Ghazzālī, *Al-Munqidh min al-Ḍalāl*, 185-186.
30. Barrett, Justin L. *Why Would Anyone Believe in God?* (Walnut Creek, CA: AltaMira Press, 2004), 66.
31. al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 2:94 #1358.
32. Ibn Taymīyah, Taqī al-Dīn. *Majmū' al-Fatāwà*. (al-Madīnah al-Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd li-Ṭibā'at al-Muṣḥaf al-Sharīf, 1995), 16:328.
33. Barrett, *Cognitive Science, Religion, and Theology*, 49.
34. Sūrat al-Rūm 30:8.
35. Sūrat al-Ṭūr 52:35-36.
36. Ibn Ḥajar. *Fatḥ al-Bārī bi-Sharḥ al-Bukhārī*. (Bayrūt, Lubnān: Dār al-Ma'rifah, 1959), 8:603.
37. Hacınebioğlu, İsamail L. *Does God Exist? : Logical Foundations of the Cosmological Argument*. (Istanbul: Insan, 2008), 188.
38. al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* 6:140 #4854.
39. Ibn Kathīr, Ismā'īl ibn 'Umar. *Tafsīr al-Qurān al-'Aẓīm*. (Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 1998), 7:406, verse 52:35.
40. Ibn Abī al-'Izz, and Aḥmad al-Ṭaḥāwī. *Sharḥ al-'Aqīdah al-Ṭaḥāwīyah*. (Bayrūt: Mu'assasat al-Risālah, 1997), 1:36.
41. Ibn al-Qayyim. *Miftāḥ Dār al-Sa'ādah wa Manshūr Wilāyat al-'Ilm wa al-Idārah*. (Bayrūt, Lubnān : Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 2002), 1:214.

উন্নয়ন বিষয়ক নিবন্ধ

১.

পদ্মা সেতু : দেশের শত বছরের স্বপ্নপূরণ

মিজানুর রহমান মিখুন

দেশি-বিদেশি নানান ষড়যন্ত্রকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে অবশেষে সম্পন্ন হলো পদ্মা সেতুর স্প্যান বসানোর কাজ। এই বিশাল কর্মযজ্ঞের পেছনে যে মানুষটি নিরলস কাজ করেছেন, যিনি আমাদের শত বছরের স্বপ্নের পদ্মা সেতুর বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন,- তিনি হচ্ছেন আমাদের প্রাণপ্রিয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার পিতা যেমনি আমাদের সহস্র বছরের স্বপ্নের স্বাধীনতা উপহার দিয়েছেন, তেমনি শেখ হাসিনা পদ্মা সেতুর মত শত বছরের অরাধ্য স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করেছেন।

এজন্য সমস্ত দেশবাসীর কাছ থেকে জনমানুষের প্রিয় নেতা শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ। আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রধানমন্ত্রী শেখ হসিনাকে ইতিহাসের অনন্য স্থানে আসন করে দিয়েছে। তিনিই যে আমাদের সব স্বপ্ন বাস্তবায়ন করবেন এবং করতে পারবেন তা প্রমাণ করে দেখিয়ে দিলেন। এজন্য এ জাতির কাছে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ১১ ডিসেম্বর দুপুর ১২টা ২ মিনিটে পদ্মার বুকে বসানো হলো শেষ স্প্যানটি। সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণ অবয়বে আত্মপ্রকাশ করল স্বপ্নের পদ্মা সেতু। প্রমত্তা পদ্মার দুই পাড়ের এ সম্মিলনে চারপাশ মুখর হয়ে উঠল উল্লাসধ্বনিতে। এ মাহেন্দ্রক্ষণ ঘিরে পদ্মাপাড়ে সেদিন ছিল উৎসবের আমেজ। কেবল দুই তীরের বাসিন্দারাই নন, ঢাকা থেকেও অনেকে সেখানে উপস্থিত হন ঐতিহাসিক মুহূর্তটিতে সাক্ষী হয়ে থাকতে।

সর্বশেষ বসানো স্প্যানটির এক পাশে টাঙানো হয় বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা, অন্য পাশে প্রকল্পটি বাস্তবায়নকারী দেশ চীনের পতাকা। ৩২০০ টন ওজনের ১৫০ মিটার দীর্ঘ ৪১তম স্প্যানটি মাওয়ার কুমারভোগের কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ড থেকে নিয়ে ১২ ও ১৩ নম্বর খুঁটির কাছে পৌঁছে যায় ভাসমান ক্রেন 'তিয়ান-ই'। সকাল ৯টায় যখন পদ্মা সেতুর শেষ স্প্যান বসানোর কাজ শুরু হয়, চারপাশ তখন কুয়াশায় মোড়ানো।

একদিকে ইঞ্চি মেপে মেপে ৪১তম স্প্যানটি বসানোর কাজ এগোতে থাকে। অন্যদিকে আকাশের মলিন মুখও ধীরে ধীরে ফর্সা হতে থাকে। দুপুর ১২টা ২ মিনিটে ১২ ও ১৩ নম্বর খুঁটিতে শেষ স্প্যানটি বসানোর মাধ্যমে যুক্ত হয় প্রমত্তা পদ্মার দুই পাড়। এক প্রান্তে মুন্সীগঞ্জের মাওয়া, অন্যপ্রান্তে শরীয়তপুরের জাজিরা। পদ্মার বুকে পুরো অবয়ব নিয়ে দেখা দেয় স্বপ্নের সেতু। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী নেতৃত্বের কারণেই স্বপ্নের পদ্মা সেতু দৃশ্যমান হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর মানবিক ও সাহসী নেতৃত্বের কারণেই সব অসম্ভবকে সম্ভব করে বাংলাদেশ আজ বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে আমরাও পারি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে মূল সেতুর নির্মাণ ও নদীশাসন কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ২০১৭ সালে পদ্মা সেতুর প্রথম স্প্যান বসানোর সময় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে অংশ নিতে যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন। এবার শেষ স্প্যান বসানোর ঐতিহাসিক মুহূর্তটি উদযাপনে বড় কর্মসূচি নেয়া হয়নি করোনা পরিস্থিতির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে।

৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দৈর্ঘের এ সেতুটির শেষ স্প্যানটি বসানোর কাজ দেখতে কৌতূহলী অনেকে নৌকা, ট্রলার, স্পিডবোট ভাড়া করে নদীর বুকে ভিড় জমান। সর্বশেষ স্প্যানটি বসানোর মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত পদ্মা সেতুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বড় কাজের সমাপ্তি হলো। এরপর সড়ক ও রেলের স্ল্যাব বসানো সম্পন্ন হলে সেতু দিয়ে যানবাহন ও ট্রেন চলাচল করতে পারবে। এতে দেশের

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২৯ জেলার সঙ্গে সারাদেশের সরাসরি সংযোগ স্থাপন হওয়ার পথ উন্মুক্ত হবে।

২০২১ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই সেতুটি যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। যদিও প্রকল্পসংশ্লিষ্টরা আশা করছেন, ২০২২ সালের মধ্যে পুরোপুরি চালু হবে সেতুটি।

স্টিল ও কংক্রিটের মিশ্রণে হচ্ছে দেশের অন্যতম এ অবকাঠামোটির নির্মাণকাজ। সেতুর মূল কাঠামো বা স্প্যানগুলো স্টিলের; খুঁটি ও যান চলাচলের পথটি কংক্রিটের।

প্রতিটি স্প্যানের দৈর্ঘ্য ১৫০ মিটার। ৪২টি খুঁটির সঙ্গে ৪১টি স্প্যান যুক্ত করার মাধ্যমে পুরো সেতু দৃশ্যমান হয়েছে। প্রথম স্প্যানটি বসেছিল ২০১৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। আর সব স্প্যান বসাতে লেগেছে তিন বছর দুই মাস। যে ৪১টি স্প্যান দিয়ে পুরো পদ্মা সেতু তৈরি হচ্ছে, তার মধ্যে জাজিরা প্রান্তে ২০টি বসানো হয়েছে। মাওয়া প্রান্তে বসানো হয়েছে ২০টি। একটি স্প্যান বসেছে মাওয়া ও জাজিরা প্রান্তের মাঝখানে। পদ্মা সেতুর জন্য অপেক্ষা প্রায় দুই যুগের।

১৯৯৮ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই দিয়ে এই অপেক্ষার শুরু। এর মাঝখানে অর্থায়ন নিয়ে বিশ্বব্যাংকসহ দাতাদের সঙ্গে জটিলতায় স্বপ্নের সেতুর ভবিষ্যৎই শঙ্কায় পড়ে যায়। এর মধ্যে সরকার বিশ্বব্যাংকের ঋণ না নিয়ে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর মতো বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়। তবে পথটি মোটেও মসৃণ ছিল না। নকশা জটিলতার কারণে এক বছর পিছিয়ে যায়।

২২টি খুঁটির নিচে নরম মাটি পাওয়া যায়। শুরুতে প্রতিটি খুঁটির নিচে ছয়টি করে পাইল (মাটির গভীরে স্টিলের ভিত্তি বসানো) বসানোর পরিকল্পনা ছিল। যুক্তরাজ্যের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নকশা সংশোধন করে একটি করে পাইল বাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত দেয়। এ জন্য খুঁটি নির্মাণকাজ পুরোপুরি শেষ হতে চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত সময় লেগে যায়। সব মিলিয়ে এই কাজে প্রায় এক বছর বাড়তি লাগে। এ জন্য মাঝে কাজে কিছুটা গতি হারায়। ঠিকাদারকে দুই বছর আট মাস বাড়তি সময় দেয়া হয়।

মূল সেতু ও নদীশাসনের কাজ শুরুর পর নানা চ্যালেঞ্জ এসেছে। কখনো পদ্মার ভাঙন, আবার কখনো কারিগরি জটিলতায় কাজ আটকে গেছে। ফেরিঘাট স্থানান্তরেও সময়ক্ষেপণ হয়; কিন্তু কাজ থেমে থাকেনি। তা ছাড়া করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতি এবং বন্যার অত্যধিক স্রোত পদ্মা সেতুর কাজে কিছুটা গতি কমিয়ে দিয়েছিল।

করোনা ও বন্যা পরিস্থিতির ধকল কাটিয়ে গত ১১ অক্টোবর ৩২তম স্প্যান বসানোর পর অনুকূল আবহাওয়া পাওয়া যায়। কারিগরি কোনো জটিলতা তৈরি হয়নি। ফলে টানা বাকি স্প্যানগুলো বসানো সম্ভব হয়।

২০০১ সালের ৪ জুলাই পদ্মা সেতুর নির্মাণে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিস্তারিত সমীক্ষার পর ২০০৪ সালে মাওয়া-জাজিরা প্রান্তে পদ্মা সেতু নির্মাণের পরামর্শ দেয় জাপানের দাতা সংস্থা জাইকা। ২০০৭ সালে একনেকে পাস হওয়া পদ্মা সেতু প্রকল্পের ব্যয় ছিল ১০ হাজার ১৬২ কোটি টাকা।

২০১১ সালে ব্যয় বাড়িয়ে করা হয় ২০ হাজার ৫০৭ কোটি টাকা। ২০১৬ সালে দ্বিতীয় দফা সংশোধনের পর ব্যয় দাঁড়ায় ২৮ হাজার ৭৯৩ কোটি টাকা।

এর পর প্রকল্প প্রস্তাব সংশোধন না করে ২০১৮ সালের জুনে আবার ব্যয় বেড়ে দাঁড়ায় ৩০ হাজার ১৯৩ কোটি টাকা।

এবার জেনে নিই পদ্মা সেতু সম্পর্কে নানা বিষয় পদ্মা সেতুর পাইল বা মাটির গভীরে বসানো ভিত্তি এখন পর্যন্ত বিশ্বে গভীরতম। সর্বোচ্চ ১২২ মিটার গভীর পর্যন্ত গেছে এই সেতুর অবকাঠামো।

সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশ্বে এটি এক অনন্য সংযোজন। এরকম আরও বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে এই সেতু বিশ্বজুড়ে প্রকৌশলবিদ্যায় সংযোজিত হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বাংলাদেশ পলিমাটির দেশ। যে কারণে পানির গভীরে শক্ত মাটি পাওয়া যায় না। এর ফলে পাইল গভীর করতে হয়।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক খান মাহমুদ আমানত বলেন, পদ্মা সেতুর মতো সেতু দুনিয়ার কোথাও নেই বলা যায়। কারণ, এর কারিগরি চ্যালেঞ্জগুলো অন্য কোনো সেতুতে ছিল না। পদ্মা সেতুর পাইল বিশ্বে গভীরতম। এই কাজ ছিল সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং। যমুনা নদীর ওপর বঙ্গবন্ধু সেতু যখন হয়, তখন সেটির পাইলও ছিল বিশ্বে গভীরতম।

বর্তমানে এক্সপ্রেসওয়েকেও সেতু হিসেবে গণ্য করা হয়। সে কারণেই বিশ্বের দীর্ঘতম সেতুর তালিকা করা এখন অনেকটা কঠিন। তবে এটি নিশ্চিত করেই বলা যায়, ইন্দো-গাঙ্গেয় সমভূমিতে নির্মিত দ্বিতীয় বৃহত্তম সেতু হতে চলেছে পদ্মা সেতু।

পদ্মা সেতুর বিশেষত্ব হলো, এটি দ্বিতল। নিচের অংশে ছুটবে ট্রেন, ওপর দিয়ে চলবে গাড়ি। বঙ্গবন্ধু সেতুও সড়ক ও রেলসেতু। তবে এই সেতুতে সড়কপথের পাশ দিয়েই চলে গেছে রেললাইন। ৪ দশমিক ৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই সেতু ১৯৯৮ সালের জুনে উদ্বোধন করা হয়।

আমাদের পদ্মা সেতু, আমাদের গর্ব। পদ্মা সেতুর মতো এমন আরও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপহার দেবেন, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন এটাই আমরা প্রত্যাশা করতে পারি। কারণ তিনি তার পিতা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণে বদ্ধপরিকর। তিনি আমাদের আশা-প্রত্যাশা স্বাপ্নের বাতিঘর।♦

মসলিন কাপড় হাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

২.

ফিরে আসছে সেই হারানো ঐতিহ্যবাহী মসলিন শাড়ি...

১৭০ বছর পর আবার বাংলাদেশে তৈরি হল মসলিন কাপড়

ডা. সুস্মিতা দেবনাথ

সালটা ২০১৪। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গিয়েছিলেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে। নির্দেশ দিলেন, যেভাবেই হোক, গবেষণা করে মসলিন কাপড় আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। এজন্য যা যা লাগে, গবেষণায় নিযুক্ত গবেষকদের সব ধরনের লজিস্টিক সাপোর্টই দেয়া হবে। ব্যাস প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়।

তাঁদের প্রথম কাজ ছিল, যে তুলা থেকে সুতা কেটে মসলিন শাড়ি বোনা হতো, সেই তুলার গাছ তথা ফুটি কার্পাস খুঁজে বের করা। আরো দরকার, মসলিনের একটি নমুনা বা স্যাম্পল। মসলিন কাপড়ের নমুনা পেলে তার সুতার ডিএনএ সিকুয়েন্স বের করে ফুটি কার্পাস গাছের ডিএনএর সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। এই গাছ পূর্ব ভারত তথা বাংলাদেশে চাষ হতো বলে সেখানে লেখা রয়েছে।

কিন্তু হাতে কোনো মসলিন কাপড়ের নমুনা নেই, নেই ফুটি কার্পাসের কোনো চিহ্নও। ছিল শুধু সুইডিস গবেষক ক্যারোলাস লিনিয়াসের লেখা 'স্পেসিস প্লান্টেরাম', আবদুল করিমের 'ঢাকাই মসলিন' এর মতো কিছু বই।

ফুটি কার্পাস বন্য অবস্থায় বাংলাদেশে কোথাও টিকে থাকার সম্ভাবনা আছে, এ ধারণার ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বন্য অবস্থায় পাওয়া তুলার জাত সংগ্রহ, নিজেদের গবেষণা মাঠে চাষ করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পরিকল্পনা করা হয়। গাছটি খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রথমে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার এক শিক্ষার্থীকে দিয়ে এর ছবি আঁকানো হয়। সেই ছবি দিয়ে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। এর মধ্যে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম তাঁর ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দেন। এটা দেখে গাজীপুরের কাপাসিয়া এলাকার একটি কলেজের অধ্যক্ষ মো. তাজউদ্দিন ফুটি কার্পাসের সন্ধান চেয়ে স্থানীয় বিভিন্ন স্কুল-কলেজে প্রচারপত্র বিলি করেন এবং মাইকিং করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৭ সালের মার্চ মাসে গাজীপুরের কাপাসিয়া ও রাঙামাটি থেকে এই গাছের খবর আসে।

গবেষকেরা গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করেন। এরপর রাঙামাটির বাঘাইছড়ি, সাজেক ও লংদু; বাগেরহাট, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম থেকে মোট ৩৮টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়। গবেষকেরা কাপাসিয়ার একটি গাছের জাতের সঙ্গে স্কেচের (আঁকা ছবির) মিল পান। দেশের অন্য কোনো উৎস থেকে মসলিনের নমুনা না পেয়ে তাঁরা জাতীয় জাদুঘর কর্তৃপক্ষের কাছে ধরনা দেন।

মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিয়ে আসার পরেও জাদুঘর কর্তৃপক্ষ তাদের মসলিনের নমুনা দেয়নি। গবেষক দলটি জাতীয় জাদুঘরের নমুনার আশায় প্রায় আট মাস পার করে ফেলেন। একপর্যায়ে মসলিনের নমুনা সংগ্রহের জন্য তাঁরা ভারতের ন্যাশনাল মিউজিয়াম কলকাতায় যান। এই মিউজিয়ামের বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, মুর্শিদাবাদে এখন যে মসলিন শাড়ি তৈরি হচ্ছে, তা দক্ষিণ ভারতে উৎপাদিত তুলা থেকে করা হয়, যা ঢাকাই মসলিনের মতো মোলায়েম নয়। তাঁদের মতে, ঢাকাই মসলিন তৈরি করতে হলে ঢাকার আশপাশ থেকে জাত

খুঁজে বের করে সেই তুলা দিয়ে সেই এলাকাতেই করতে হবে। মসলিন তৈরিতে তুলার জাত এবং আবহাওয়ার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। চাইলেই যেখানে সেখানে ঢাকাই মসলিনের মতো শাড়ি তৈরি করা যাবে না। ভারতে গিয়ে বিফল হয়ে গবেষক দল হতাশ হয়ে পড়েন।

এই খবর শুনে প্রধানমন্ত্রী তাঁদের লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আলবার্ট মিউজিয়ামে যেতে বলেন। তিনি সেখানে ঢাকাই মসলিন দেখে এসেছেন। শেষ পর্যন্ত মসলিনের একটু নমুনার জন্য ২০১৭ সালের চার সদস্যের একটি দল লন্ডনের ওই মিউজিয়ামে যান। সেখানে মসলিনের কাপড়ের নমুনা ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপাত্ত তাঁরা পেয়ে যান।

আংটির ভেতর দিয়ে চলে গেল আস্ত একটি শাড়ি!

লন্ডন থেকে সংগৃহীত মসলিন কাপড়ের ডিএনএ সিকুয়েন্স বের করা হয়। গবেষকেরা এই মসলিনের ডিএনএর সঙ্গে আগে সংগৃহীত কাপাসিয়ার একটি জাতের ফুটি কার্পাস গাছের মিল পেলেন অবশেষে।

তাঁরা নিশ্চিত হন, সেটিই তাঁদের কাঙ্ক্ষিত জাতের 'ফুটি কার্পাস'। স্থানীয় আবদুল আজিজ নামের এক ব্যক্তি এই কার্পাসের সন্ধান দিয়েছিলেন। খুশি হয়ে এই কমিটির পক্ষ থেকে তাঁকে একটি মোবাইল ফোন উপহার দেওয়া হয়।

তুলা থেকে ৫০০ কাউন্টের সুতা তৈরি করা চাট্টিখানি কথা নয়। এই সুতা আধুনিক যন্ত্রে হবে না, চরকায় কাটতে হবে। এবার খোঁজ শুরু হয় দেশের কোথায় এখনো তাঁতিরা চরকায় সুতা কাটেন। খবর আসে, কুমিল্লার চান্দিনায় এখনো এই তাঁতিরা রয়েছেন। তাঁরা খদ্দরের জন্য চরকায় মোটা সুতা কাটেন। তবে সেই সুতা কাউন্টের মাপেই আসে না। নতুন করে এই সুতা কাটার জন্য চরকা তৈরি করেন মঞ্জুরুল ইসলাম ও টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অধ্যাপক আলীমুজ্জামান।

সুতা মিহি করার ব্যাপারটা আসলে তিন আঙুলের জাদু। তিন আঙুলে কীভাবে তুলা ছাড়তে হবে, সেটাই আবিষ্কার করতে হয়েছে। আর নারীদের আঙুলেই এই সুতা সবচেয়ে মিহি হয়।

লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আলবার্ট মিউজিয়ামে প্রায় সাড়ে তিন শ ঢাকাই মসলিন শাড়ি সংরক্ষিত আছে। সেখানে রাখা ১৭১০ সালে বোনা শাড়ির নকশা দেখে হুবহু একটি শাড়ি বুনে প্রথম অবস্থায় শাড়িটি তৈরি করতে খরচ পড়েছে ৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা। গবেষকদের প্রত্যাশা, এই খরচ আস্তে আস্তে কমতে থাকবে। ইতোমধ্যে তাঁরা মোট ছয়টি শাড়ি তৈরি করেছেন। একটি শাড়ি প্রধানমন্ত্রীকে উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে আজ ৪৯ বছর। এর আগে পাকিস্তান আমল, তারও আগে চলেছে ব্রিটিশ আমল। এই দীর্ঘ সময় ধরে কোনো নেতা নেত্রীর মাথায় এই চিন্তাটি আসেনি যে গবেষণা করে বাংলার এই ঐতিহ্য আবার ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করার। নেহরু আফসোস করে লিখেছিলেন, আজ থেকে ৫০০০ বছর আগের মিশরীয় মমীর শরীরে ভারতবর্ষের মসলিনের দেখা মেলে, অর্থাৎ চার পাঁচ হাজার বছর আগেও উপমহাদেশ থেকে মসলিন কাপড় বণিকের হাত ধরে পৌঁছে যেতো ফারাও'দের কাছে। সেই মসলিন হারিয়ে গিয়েছিলো। সেই মসলিন আবার ফিরে এসেছে। আন্তর্জাতিকভাবে মসলিনকে এদেশীয় পণ্য হিসেবে স্বীকৃতিও দেয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নানান কারণেই স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বাংলাদেশের ইতিহাসে। তার লেগ্যাসি'তে লিখা থাকবে..

'শেখ হাসিনা, যিনি মসলিন কাপড় ফিরিয়ে এনেছিল' -- ইতিহাস।

সৌজন্যে : ডা. সুস্মিতা দেবনাথ এর ফেসবুক ওয়াল থেকে।

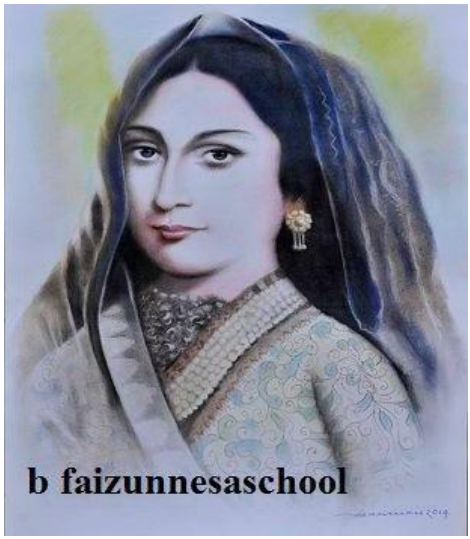

নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী

গোলাম মোহাম্মদ আইয়ুব খান

‘বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর’।

কবি নজরুল ইসলামের পংক্তিদ্বয়ের প্রতি যথাযথ আস্থা ও শ্রদ্ধা জানিয়ে নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী’র গৌরব গাঁথা জীবনী কিছু বিষয়ে আলোকপাত করছি। গর্বিত হচ্ছি কুমিল্লার মেয়ে কুমিল্লার বৌ হয়ে তিনি বিশ্বকে আলোকিত করেছেন। বিশ্বের প্রথম ও একমাত্র মহিলা নবাব হবার যে গৌরব তিনি অর্জন করেছেন তার বদৌলতে ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

পারিবারিক ঐতিহ্যের পরিচয়

‘রূপজালাল’ গ্রন্থে ফয়জুন্নেছা তাঁর পরিচয় দিয়েছেন যে, তাঁর পিতৃপুরুষ আরবের কুরায়শ বংশীয়। দিল্লির সম্রাট শাহ আলমের (সম্রাট বাহাদুর শাহ) সময় কুরায়শ বংশীয় আগন খাঁ দিল্লির সম্রাটের রাজকার্যাদি যথা নিয়মে দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। সম্রাট সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে আমির উপাধি দেন। এতে তিনি আমির আগন খাঁ নামে পরিচিত হন। এর মধ্যে বঙ্গীয় অঞ্চলে প্রজা বিদ্রোহ

দেখা দিলে সম্রাটের নির্দেশে আমির আগন খাঁ লক্ষাধিক পদাতিক বাহিনী নিয়ে স্বপরিবারে বাংলায় আগমন করেন। প্রজা সমস্যা সমাধানের পর তিনি দিল্লী ফিরে গেলেও তার পুত্র মির্যা আব্রু খাঁ (মির্যা ভূরু খাঁ) বঙ্গীয় অঞ্চলের প্রকৃতি, জনগণের আচার আচরণে আকৃষ্ট হয়ে দিল্লী ফিরে না গিয়ে এ বাংলায় থেকে যান। পুত্রের ভবিষৎ চিন্তায় পিতা আমির আগন খাঁ মির্যা আব্রু খাঁ কে পত্তন দেওয়ার জন্য দিল্লীর সম্রাটের নিকট আবেদন করেন। সম্রাট আমিরের কর্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে তার পুরস্কার হিসেবে মির্যা আব্রু খাঁ, কে পূর্ব জাহাঙ্গীর নগরের অধীন হোমনাবাদ অঞ্চলের জমিদারী লিখে দেন। আমির আগন খাঁ'র ৬ষ্ঠ অধস্তন বংশধর হলেন নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী। মহিয়সী নারী নবাব ফয়জুন্নেছার জন্ম ১৮৩৪ সালে। বর্তমান কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলায় ডাকাতিয়া নদীর উত্তর পাড়ে পশ্চিম গাঁও গ্রামে। তাঁর পিতার নাম আহমদ আলী চৌধুরী এবং মাতা আরফুন্নেছা। পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে ফয়জুন্নেছা তৃতীয়। হোমনাবাদ পরগণার জমিদার আহমদ আলী চৌধুরীর রূপবতী কন্যা 'ফয়জুন' ছোটবেলাই ছিলেন খুবই বুদ্ধিমতি। তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার জন্যই তিনি পেয়েছিলেন বিশাল জমিদারী পরিচালনার প্রশিক্ষণ ও দায়িত্বভার।

শিক্ষাজীবন

শৈশবেই ফয়জুন্নেছার বাবা মারা যান। তাঁকে কোনো স্কুলে পাঠানো হয়নি। ফলে ফয়জুন্নেছার কোন প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। ছিল না স্কুল, কলেজ-মাদ্রাসার কোন ডিগ্রি। গৃহই ছিল তার শিক্ষায়াতন। গৃহশিক্ষক ছিলেন জনাব তাজউদ্দিন মিয়া। সে যুগে অভিজাত পরিবারের ভাষা ছিল ফার্সী অথবা উর্দ্দু। অথচ জমিদার বাড়ির মেয়ে হয়েও ফয়জুন্নেছা লেখাপড়া শিখেন বাংলা মাধ্যমে। জ্ঞান চর্চার অদম্য স্পৃহা ছিল। পর্দা প্রথার অন্তরালে থেকেই তিনি বাংলা, উর্দ্দু, ফার্সি ও সংস্কৃত চারটি ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করেন। তবে বাংলার জ্ঞানই সবচেয়ে বেশি ছিল। ফলে সাহিত্য চর্চা বাংলা ভাষায় করেছেন। গভীর মনযোগের সাথে তিনি সর্বদা জ্ঞানের চর্চা করতেন।

বৈবাহিক জীবন

পশ্চিম গাঁও জমিদার বাড়ির কিশোরী মেয়ে ফয়জুন্নেছা'র বিয়ের প্রস্তাব আসে লাকসামের অদূরে ভাউকসার গ্রামের জমিদার পুত্র মোহাম্মদ গাজী চৌধুরীর পক্ষ থেকে। গাজী চৌধুরী ছিলেন ফয়জুন্নেছার পিতার দূরসম্পর্কীয় ভাগিনা। তিনি ইতিপূর্বে সরাইল জমিদার বাড়িতে বিয়ে করেন। ফয়জুন্নেছার রূপে-গুনে মুগ্ধ গাজী চৌধুরীর প্রস্তাব প্রথমে ফিরিয়ে দিলেও ফয়জুন্নেছার পিতার মৃত্যুর পর অসহায় মাতা আরফুন্নেছা শেষ পর্যন্ত বিয়েতে সম্মতি দেন। তবে শর্ত ছিল, ফয়জুন্নেছা সতীনের সাথে একত্রে বসবাস করতে ভাউকসারে যাবে না, পশ্চিম

গাঁও-এ থাকবেন। বিয়ের কিছুকাল পরে তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। পিতার জমিদারীর এক বিরাট অংশের তিনি মালিক হন। জামিদারীর কাজ চালাবার জন্য তাঁকে পশ্চিম গাঁয়েই থাকতে হয়। দাম্পত্য জীবনে ফয়জুন্নেছা ২ কন্যার মা হন। তারা হলেন আরশাদুন্নেছা ও বদরুন্নেছা চৌধুরানী। আরশাদুন্নেছা অল্প বয়সেই এবং ফয়জুন্নেছার জীবদ্দশাতেই মৃত্যুবরণ করেন। মোহম্মদ গাজী চৌধুরী বেশির ভাগ সময় পশ্চিম গাঁও এ ফয়জুন্নেছার সাথে বসবাস করতেন এবং তাঁদের দাম্পত্য জীবন সুখেই কাটছিল। কিন্তু হায়! দাম্পত্য জীবনের সুখের পরশ চৈত্রের তাপদাহে শুকনো পাতার মতো উড়িয়ে নিয়ে যায়। এক জোৎস্না রাতে ফয়জুন্নেছাকে নিয়ে গাজী চৌধুরী ডাকাতিয়া নদীতে বজরা (নৌকা)'য় করে নৌ বিহারে বের হন। ফয়জুন্নেছাকে না বলেই গাজী চৌধুরী বজরা ভাউকসারের জমিদার বাড়ির ঘাটে ভিড়ান এবং অনেকটা জোর করেই তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান। ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক সপ্তাহ সেখানে অবস্থান করে ফয়জুন্নেছা পশ্চিম গাঁও-এ ফিরে আসেন। বিয়ের শর্ত ভঙ্গ করা এবং চাতুর্যতার আশ্রয় নেয়ায় স্বামীর দেয়া শর্ত মেনে নিয়েই তিনি ছোট মেয়ে বদরুন্নেছা কে নিয়ে স্বামীর বাড়ি ত্যাগ করেন। তালাক হয়নি কিন্তু জীবদ্দশায় ফয়জুন্নেছা স্বামীর সাথে সাক্ষাৎও করেননি।

হোমনাবাদে নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানীর বাড়ি

জনহিতকর কাজ

নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী হোমনাবাদে বিশাল জমিদারীর মলিক হয়েও প্রজাসাধারণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য তিনি পাল্‌কিতে চড়ে বিভিন্ন মৌজা-কাচারী এলাকা পরিদর্শনে বের হতেন। সুদক্ষ নায়েব দেওয়ান লকিয়ত উল্লাহর বিশ্বস্ত ও বিচক্ষণ কর্মতৎপরতা ও পরামর্শে তাঁর গরিব-দুঃখী প্রজাদের জন্য বিভিন্ন মৌজায় পুকুর-দীঘি খনন করান, রাস্তা-ঘাট-পুল তৈরি করান। মসজিদ মক্তব-প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করান। ফয়জুন্নেছার অমরকীর্তি ৩০ জ্যৈষ্ঠ

১২৯৮বঙ্গাব্দে (১৮৯২ সালে) সম্পাদিত ওয়াকফনামা। বিশাল জমিদারির বার্ষিক আয়ের তৎকালীন ১,০০,০০০ টাকার মধ্যে ৬০,০০০ টাকাই (৬০%ভাগ) 'আল্লাহর নামে মানব সেবায় দান' করেছেন। নবাব বাড়ির মুসাফির খানা সৌদি আরবের মুসাফির খানা এবং সেখানকার মাদ্রাসার সওলাতিয়া ও ফোরকানীয়া মাদ্রাসা স্থাপন ও পরিচালনা, পর্দানশীন মেয়েদের শিক্ষাবৃত্তি, মসজিদ নির্মাণ এবং এছাড়া ও পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগরে স্কুল স্থাপন, স্বর্ণকুমারী দেবীর নারী কল্যাণ প্রতিষ্ঠান এবং কুমিল্লায় নবাব ফয়জুন্নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনে বহু টাকা দান করেন। মক্কাশরীফ ও মদিনা মুনাওয়ারার জন্যও তিনি নিয়মিত অনুদান বরাদ্দ করে যান। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা অবধি তার উওরাধিকারগণ এ ওয়াকফ তহবিল হতে নিয়মিত অনুদানের অর্থ আরবসহ বিভিন্ন দেশ ও প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করতেন। অতিসম্প্রতি সৌদি আরবের মান্যবর রাষ্ট্রদূত কৃতজ্ঞতার সাথে তা স্মরণ করেন। এখনো তাঁর এ ওয়াকফ তহবিল হতে বিভিন্ন লোক ও প্রতিষ্ঠান সাহায্য পায়। মানবতার কল্যাণে ফয়জুন্নেছার আর একটি বড় আবদান হলো ১৮৯৩ সালে কুমিল্লা শহরে ফয়জুন্নেছা জানানা হাসপাতাল স্থাপন। জানানা ফার্সি শব্দ যার আর্থ মহিলা। শুধুমাত্র মহিলাদের চিকিৎসার জন্য উক্ত হাসপাতালে ইংরেজ ডাক্তার ও প্রশিক্ষিত নার্স নিয়োগ করেন। ডাক্তার-নার্সদের আবাসিক কোয়ার্টারও নির্মাণ করে দিয়েছেন। গরীব প্রজাসাধারণের চিকিৎসার জন্য লাকসামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। এছাড়াও গরীব প্রজাসাধারণের চিকিৎসার জন্য অকাতরে দান করেছেন। প্রকাশ্য দানের চেয়ে গোপন দানই ছিল বেশি। যার হিসাব পাওয়া দুস্কর। বর্তমান জেনারেল হাসপাতাল কুমিল্লা সদর হাসপাতাল নামে নামকরণ করা হয়েছে। কুমিল্লা শহরে ১৮৭৩ সালে মেয়েদের জন্য ফয়জুন্নেছা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল চালু করেছিলেন যে যুগে পুরুষদেরই ইংরেজি শেখা ছিল নিষিদ্ধ সে সময় নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী মেয়েদের জন্য ইংরেজী শেখানোর রীতিমত দুংসাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। নবাব ফয়জুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়, বদরুন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয়, নবাব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, শৈলরাণী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ প্রতিষ্ঠায়ও তাঁর অবদান রয়েছে। জমিদারির ১৪টি কাছারীর প্রত্যেকটিতে ১টি করে এবং কুমিল্লা শহরে আরও একটি সহ মোট ১৫টি প্রথমিক বিদ্যালয় নিজ ব্যয়ে প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু নিজের জমিদারী এলাকাতেই নয় সমগ্র বাংলায় ছিল তাঁর দানের হস্ত প্রসারিত। বাংলার সীমানা পেরিয়ে আরব ইউরোপেও তাঁর দানের ক্ষেত্র ছিল বিস্তৃত। দারিদ্র্য বিমোচনে মাতৃ স্বাস্থ্য ও শিশু স্বাস্থ্য সেবায় এবং শিক্ষা বিস্তারে নবাব ফয়জুনেছা দান করেছেন অকাতরে, গোপনে ও প্রকাশ্যে। তাঁর দান অনুদানে প্রতিষ্ঠিত স্কুল

কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল, মহিলা সংস্থা, মুহাফিজ খানা এখনও বিশ্বব্যাপী মানবতার কল্যাণে অবদান রেখে যাচ্ছে। Jole নামক একটি সংস্কৃত স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। লাকসামে ১টি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন। মাদ্রাসাটি সময়ের চাহিদার আলোকে কলেজে উন্নতি করা হয়েছে। যা বর্তমানে নবাব ফয়েজুন্নেছা সরকারি কলেজ। পরবর্তীতে ডাকাতিয়া নদীর পাড়ে গাজীমুড়ায় ফয়জুন্নেছার স্মৃতি রক্ষার্তে মাদ্রাসাটি পুনরায় শিক্ষা বিস্তার করে চলছে। যে সময়ে মেয়েরা রাস্তায় বের হতো না সে যুগে নারীদের বিশ্বাস ছিল, নারীরা দোজখে যাবে যদি তাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়। সেই যুগে একজন নারী হয়ে ফয়জুন্নেছা শুধু নিজ দেশেই নয় বিদেশেও ভারতের পশ্চিম বঙ্গে এবং বর্তমান সৌদি আরব (মক্কায়) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার ব্যয়ভার বহন করেন। পর্দানশীল মেয়েদেরকে পড়া লেখায় উৎসাহী করার জন্য তিনি 'মেয়েদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি' চালু করেন। নবাব ফয়জুন্নেছা যখন নারী শিক্ষার আন্দোলন পরিচালনা করেছেন তখন বর্তমান যুগে নারী শিক্ষার আলোর দিশারী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জন্মও হয়নি। এ অনুচ্ছেদের শেষ প্রান্তে এ কথা না বলেই পারছিনা যে, নওয়াব ফয়জুন্নেছার যথাসময়ে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের কারণে কুমিল্লা এবং পার্শ্ববর্তী নোয়াখালী ও চাঁদপুর জেলায় শিক্ষার হার অনেক বেশি। তাঁর মেয়ে বদরুন্নেছা ও নাতিরাও শিক্ষার জন্য দান করে গেছেন।

সাহিত্য চর্চা

নবাব ফয়জুন্নেছা সাহিত্য চর্চায় যথেষ্ঠ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সাহিত্য চর্চা ও জ্ঞানের গভীরতা অনুধাবন করা যায় ১৮৭৬ সালে মুদ্রিত ৪৭২ পৃষ্ঠার বিশাল 'রূপজালাল' কাব্য গ্রন্থ অধ্যায়নে। অথচ তখনো বাংলা কাব্য চর্চায় হাতে গোণা কয়েকজন কবি ছিলেন মাত্র। ফয়জুন্নেছা তার 'ফয়জুন পুস্তাকালয়' (ব্যক্তিগত পাঠাগার) পুস্তকের বিপুল সংগ্রহ গড়ে তোলেন। যেখানে প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে তিনি সাহিত্য চর্চা করতেন। স্বামী সোহাগ বঞ্চিত, বড় মেয়ে হারানোর একবুক জ্বালা বুকে নিয়েও তাঁর অমর সৃষ্টি বিশাল কাব্যগ্রন্থ 'রূপজালাল' স্বামীর নামে উৎসর্গ করেন। স্বামীর প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা তাঁর রূপজালাল গ্রন্থের কবিতায় ছত্রে ছত্রে বিবৃত হয়েছে। স্বামীর বিরহ বিচ্ছেদ যাতনার করুণ বর্ণনা রূপজালালের বিরাট অংশ জুড়েই স্থান করে নিয়েছে। এতে বোধ হয় তাঁর কাব্য চর্চা, সাহিত্য সাধনার সুযোগ বেড়ে গেছে। জীবনের অনেক দুঃখ বেদনাকে লালন করে বেঁচে ছিলেন। সংগিত সার ও সংগিত লাহরি নামে তাঁর দুইটি কবিতা গ্রন্থ রয়েছে। আরো আনেক গুলো গ্রন্থ সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে গেছে। তিনি সুধাকর ও ইসলাম প্রচার নামক দুইটি পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি কোলকাতার ঠাকুর পরিবারের সালেহি সমিতির সদস্য ছিলেন।

শিক্ষা প্রসারে অবদান

এমন এক যুগে নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী জন্মেছিলেন যখন মুসলমান রাজ্যহারা হয়ে নানাবিধ সামাজিক দুর্দশায় নিপতিত হয়েছিল। মুসলমান সমাজ এ দূরাবস্থা থেকে মুক্তির কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। মুসলমানদের নিকট থেকে নানা কূটকৌশলে মনগড়া আইনের বেড়াজালে রাজ্য-ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিল বিধায় ইংরেজ জাতি মুসলমানদেরকেই প্রতিপক্ষ করে হিন্দুদেরকে করে নেয় সহযোগী। মুসলমানদের উপর চালাতে থাকে দমন-পীড়ন, নির্যাতন-নিপীড়ন। ফলে মুসলমানরা রাজ্য হারিয়ে হয়ে পড়ে রিক্ত নিঃস্ব। যাদের ঘরে ঝিঁয়ের কাজ করা ছিল গৌরবের বিষয়, সে সকল মুসলিম পরিবারের মা-বোনেরা পেটের দায়ে পাচকের চাকুরি নিতে বাধ্য হয়। এর ফলে ইংরেজদের প্রতি মুসলমানদের ঘৃণাবোধ এতবেশি প্রবল হয়ে পড়ে যে, 'ইংরেজি ভাষা কাফিরের ভাষা, ইংরেজি শিখলে ছোটখাট কাফির হয়ে যাবে। একটা আস্ত শয়তানে পরিণত হবে। মৃত্যুর সময় কালেমা নসিব হবে না'- এ সকল কথা ধর্মীয় বিধানের মতই প্রচলিত হয়ে পড়ে। ফলে ইংরেজি শিক্ষা থেকে মুসলমান বিরত থাকে।

মুসলমানদের ভাষা ছিল বাংলা-উর্দু-ফার্সি। অফিস আদালতের ভাষা ছিল ফার্সি। ইংরেজরা অফিস-আদালতের ভাষা ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজি চালু করায় মুসলমানরা হয়ে পড়ে চাকুরিহারা কর্মহীন বেকার। ইসলামী শরীয়তী আইনের পরিবর্তে ১৭৭৩ সাল থেকে চালু করে কোম্পানী আইন। পরবর্তীতে তার আংশিক সংশোধন করে চালু করা হয় খ্রিস্টানদের তৈরি রোমান আইন। এজন্য ইসলামী আইন আদালত বন্ধ হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে মুসলমানরা অফিস আদালত থেকে হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন। ইংরেজি পরিত্যাগ করায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের দুর্ভোগের মাত্রা আরও বাড়িয়ে নিয়েছে। এ সুযোগে হিন্দু সম্প্রদায় ইংরেজি শিখে ইংরেজদের আনুকূল্য লাভ করে সরকারি চাকুরি, ক্ষমতা-বিত্ত-বৈভবের অংশীদার। তখন মুনলমানদের দূরাবস্থা এমন চরমে পৌঁছে যে, দেড় টাকা বেতনের চাকুরির জন্য হিমালয়ের চূড়ায় আরোহণ করতে হলেও রাজী ছিল তারা। আফিস আদালতের ঝাড়ুদার কিম্বা চাপরাশির চাকুরির জন্যও মুসলমানদের আকুতি ছিল হৃদয়বিদারক। মুসলমানদের এ কঠিন দুর্যোগের দিনে নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী তাঁর দূরদর্শী জ্ঞানের গভীরতায় উপলব্ধি করেন যে ইংরেজি শিখেই মুসলমানদের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে। এ উপলব্ধি থেকে তিনি নিজ গ্রামে পশ্চিম গাঁয়ে একটা ইংরেজি মাধ্যম স্কুল, একটা মাদ্রাসা ও একটা মেয়েদের স্কুল স্থাপন করেন। এছাড়াও বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন– যা 'জনহিতকর কাজ' এর অনুচ্ছেদে কিয়দংশ তুলে ধরা হল।

বাংলাদেশ সরকার থেকে প্রকাশিত নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানীর উপর ডাকটিকেট

নওয়াব (নবাব) উপাধি লাভ

১৮৮৭-১৮৮৯ সালের কথা। তৎকালীন ত্রিপুরা (কুমিল্লা)'র জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. ডগলাস জেলার উন্নয়নের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা হাতে নেন। এ জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান না হওয়ায় তিনি বড় বড় মহাজন ও জমিদারদের নিকট দান হিসেবে, না হলে অন্তত ঋণ হিসেবে হলেও টাকা চেয়ে পত্র লেখেন। কিন্তু কোন সাড়া না পেয়ে নিরাশ হয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেন। এমন সময় হোমনাবাদ পরগনার জমিদার ফয়জুন্নেছা চৌধুরানীর একজন দূত হাজির হল মি. ডগলাস এর দপ্তরে। দূত জানালেন, 'টাকাটা জনগণের কল্যাণে ব্যয় হবে দেখে প্রকল্পের প্রয়োজনীয় সমুদয় টাকা বেগম সাহেবা পাঠিয়েছেন এবং এও বলেছেন যে, টাকাটা ঋণ হিসেবে নয়- দান হিসেবেই দিয়েছেন'। মি. ডগলাস অবাক হলেন। যেখানে টাকার পরিমাণ দেখে বড় বড় জমিদার ও ব্যবসায়ীরা এগিয়ে এলোনা সেখানে একজন মুসলমান মহিলা জমিদার প্রকল্পের পুরো টাকাটাই যোগান দিলেন, তাও আবার কর্জ হিসেবে নয়-দান হিসেবে দিয়েছেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. ডগলাস শ্রদ্ধাবনত হয়ে সানন্দে দানের টাকা গ্রহণ করলেন। খোঁজ-খবর নিয়ে তিনি ফয়জুন্নেছার দানশীলতা, প্রজাহিতৈষী, শিক্ষানুরাগী-সাহিত্যসাধনা, অতিথি পরায়ণ ও ন্যায়নিষ্ঠার কথা মহারানী ভিক্টোরিয়াকে লিখে জানালেন। রানী খুশি হয়ে ফয়জুন্নেছাকে 'বেগম' উপাধিতে ভূষিত করতে চাইলেন। ফয়জুন্নেছা এ প্রস্তাব বিনয়ের সাথে এ বলে প্রত্যাখান করলেন যে, "মহিলা জমিদার হিসেবে প্রজারা এমনিতেই 'বেগম সাহেবা' বলে ডাকেন"। মি. ডগলাস বিষয়টি রানীকে জানালে মহারানী ভিক্টোরিয়া পুনরায় রাজদরবারে পরামর্শ করে পল্লীবাসিনী ফয়জুন্নেছা চৌধুরানীকে 'নবাব' উপাধি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ইংল্যান্ডের মন্ত্রীরাও তাতে রাজী হলেন। সেটি ছিল ১৮৮৯ সাল। হোমনাবাদের মহিলা জমিদার ফয়জুন্নেছাকে 'নবাব' উপাধি দেওয়ায়

বিশ্বব্যাপী হৈ চৈ পড়ে যায়। বিশ্ব ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি হল। একজন মুসলিম মহিলা হলেন 'নবাব'। এর সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান করা হয় কুমিল্লার নবাব বাড়িতে। সম্মাননা হিসাবে দেওয়া হয় মহামূল্যবান তারকা বসানো হিরকের মেডেল বা পদক। এ উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন ব্রিটিশ সম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশ এবং অঞ্চলের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। অভিনন্দন মোবারকবাদ আসতে লাগল। অবাক হয়ে সবাই জানতে চাইল কে এই নারী, কি তার গুন-যার জন্য দেওয়া হল 'নবাব' উপাধি? তসলিম জানাতে থাকলো নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানীকে।

প্রাত্যহিক জীবন

নবাব ফয়জুন্নেছার প্রাত্যহিক কাজের ফিরিস্তিটা দেখলে পাঠকবৃন্দ অনুমান করতে পারবেন কি রকম নিয়ম নিষ্ঠ, দরদী, সমাজকর্মী, শিক্ষানুরাগী, প্রজা হিতৈষী জমিদার এবং ধর্মপরায়ণ ছিলেন। স্বামীর সোহাগ বঞ্চিত, বড় মেয়ে আরশাদুন্নেছাকে হারিয়ে ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে বিশাল জমিদারী পরিচালনা করতে হয় ফয়জুন্নেছাকে। বিদ্যাবত্তায়-বুদ্ধিদীপ্ততায়, বিচক্ষণতা ও কর্মদক্ষতার সাথেই বিশাল জমিদারী সুযোগ্য শাসক রূপে ন্যায় নিষ্ঠ ভাবে পরিচালনা করেন। অতি সাধারণ ভাবে তিনি মোড়ায় বসে চটি জুতা পায়ে দিয়ে আজীবন জমিদারীর কঠোর দায়িত্ব পালন করেন।

নবাব ফয়জুন্নেছার জীবনে সময়ানুবর্তিতা ও নিয়ম নিষ্ঠা ছিল অনন্য বৈশিষ্ট্য। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা-হেমন্ত নির্বিশেষে সকল সময় তিনি প্রতিদিন শেষরাতে ঘুম থেকে উঠে ওযু করে যথারিতি তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে ফযর নামাজ পর্যন্ত কুরআন তেলাওয়াত করতেন। ফযর নামাজ শেষে সকাল ৮ টা পর্যন্ত কুরআন তেলাওয়াতের পর হালকা নাস্তা করে জমিদারীর দপ্তরে বসতেন। জমিদারী কাজের মধ্যেই প্রথমেই ডাক পড়ত মুসাফির খানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর। তাঁর জমিদারীতে মুসাফিরদের মেহমানদারী করা ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এরপর বসতেন জমিদারী খাতাপত্র নিয়ে। এসব করতেন তিনি পর্দার অন্তরালে থেকেই। উজির-নাজির, নায়েব-মুন্সিদেরকে প্রয়োজন মত কাজের নির্দেশ দিতেন, কাজ বুঝে নিতেন, পরামর্শ নিতেন এবং প্রজাদের অভিযোগ নালিশ নিজে সরাসরি শুনতেন এবং বিচার ফয়সালাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেন পর্দা রক্ষা করেই। বেলা ১১ টা পর্যন্ত এসব কাজ করে অন্দর মহলে ফিরতেন। সামান্য বিশ্রামের পর প্রয়োজন হলে পারিবারিক কাজ সেরে অন্দর-বাড়িতে উঁচু দেয়াল ঘেরা পুকুরে নিয়মিত সাঁতার কাটতেন। খাওয়া দাওয়ার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে যোহরের নামায আদায় করে আবার জমিদারীর কাজ নিয়ে বসতেন। বিভিন্ন রকমের জটিল বিষয়ের আলোচনা হতো। বিচারও হতো এ সময়। কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো। আসরের নামায শেষে

চলে যেতেন নিজস্ব পাঠাগার 'ফয়জুন পুস্তাকালয়-এ' পড়াশুনা ও সাহিত্য চর্চার জন্য। রাত ১০ টা অবদি ব্যক্তিগত ইবাদত, পারিবারিক কাজ শেষে ঘুমিয়ে যেতেন। এ ভাবেই চলত তার প্রাত্যহিক জীবন।

হজ্জ পালন

নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী তাঁর জ্ঞানমত ইসলামি জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি কঠোর ভাবে পর্দাসহ ধর্মীয় বিধান মেনে চলতেন। পর্দার বিধান অনুসরণে তাঁর সতর্কতা এমন ছিল যে, বংশধরদের নিকটও তার কোনা সরাসরি ফটোগ্রাফ নেই। মহারানী ভিক্টোরিয়ার ব্যক্তিগত অনুরোধে-উম্মুক্ত রাখা হবে না-এ শর্তে নবাব ফয়জুন্নেছার একখানা ফটোগ্রাফ অংকন করা হয়। বর্তমানে বাকিংহাম প্রাসাদে আবৃত অবস্থায় তা সংরক্ষিত আছে। মহিয়সী এ তাপসী রমনী ১৮৯৪ সালে হজ্জ ব্রত পালন করেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর মেয়ে বদরুন্নেছা চৌধুরানী ও নাতি মো. গাজীউল হক চৌধুরী। মক্কার মেসফালা মহল্লায় তিনি থাকেন। সেখানে বাঙালি হাজিদের দুঃখ কষ্ট দেখে তিনি ব্যথিত হন। এ জন্য হেরেম শরীফের সন্নিকটে মিসফালাহ্ মহল্লায় তিনি বঙ্গীয় গরীব হাজীদের জন্য মুসাফির খানা স্থাপন করেন এবং তা পরিচালনার জন্য যথারীতি টাকা পাঠান হতো। বহুকাল পর্যন্ত তা চলতে থাকে। এছাড়া ম্ক্কা শরীফ ও মদিনা মুনাওয়ারার জন্যও তিনি বার্ষিক টাকা বরাদ্দ করে যান। ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে এ টাকা দেওয়া হয়।

শেষ কথা

'শিক্ষার আলো- ঘরে ঘরে জ্বালো'- প্রায় দেড়শ বছর আগে এই স্লোগান ছিল যার কর্মের মূলমন্ত্র, প্রজাহিতৈষী জমিদার, একমাত্র মহিলা নবাব, অমর সাহিত্যিক শিক্ষানুরাগী, ধর্মপরায়ণ দরদী সমাজকর্মী, নারী শিক্ষার অগ্রদূত বিশ্বব্যাপি মানবতার কল্যাণে যার হস্ত ছিল প্রসারিত। সেই মহিয়সী নারী নবাব ফয়জুন্নেছা ১৯০৩ সালের অক্টোবর (বাংলা ২০ আশ্বিন, ১৩১০) মাসে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যু তাকে লোক চক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে রাখতে পারে নাই। তার মহৎ কর্মের শুভ্র আলোকে তিনি চিরদিন ভাস্বর হয়ে থাকবেন। কবি নজরুল ইসলামের কণ্ঠে ধ্বনিত হবার প্রায় ৭৩ বছর পূর্বে নবাব ফয়জুন্নেছার হৃদয় পটে ধ্বনিত হয়েছে নজরুলেরই সেই অমর বাণী-

'মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই
যেন গোর থেকে মুয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই'।

তাই তাঁর ইচ্ছাতেই ডাকাতিয়া নদীর উত্তর পাড়ে পশ্চিম গাঁও নবাব বাড়ী মসজিদের (নিজের প্রতিষ্ঠিত) পার্শ্বে নবাব ফয়জুন্নেছা সরকারি কলেজের মূল ফটকের নিকটেই এ মহিয়সী নারী চির নিদ্রায় সমাহিত আছেন।

লেখক : কলাগাছিয়া এএসএম সেকান্দার আলী চৌধুরী ডিগ্রি কলেজ, গলাচিপা, পটুয়াখালী।

শীতের সৌন্দর্য রয় আধেক অধরা

হাসান হাফিজ

আঙুল তুলেছে তীব্র শীত
ব্যবধান নির্ণয় সে করেছে সহজে
গরিবের এবং ধনীর।
শ্রেণিবৈষম্যের এত মোটা দাগ অন্য কোনো
ঋতুর আয়ত্তে নাই, অধিকারে নাই
মিলনের, একইসঙ্গে বিচ্ছেদেরও বাঁশরী বাজায়
নাড়ার আগুনে জ্বলে কতটা সে শান্তি পায়
হয়তো বা নিজেও জানে না...
শুকনো নদী, বন্ধ্যা ক্লান্ত বালুচরা,
শীতের সৌন্দর্য থাকে আলুথালু আংশিক অধরা
শীতে পাই শৈত্যপ্রবাহের ঝাপটা এবং ঝাঁকুনি
সম্পর্ক শীতল হয়, সেও কিন্তু শীতেরই প্রভাব
ওম চাই ওম নাই, কম্পন দুর্ভোগ আছে
ওগো শীত, দ্রুততায় নিয়ে যাও বসন্তের কাছে...।

মানবমন

প্রত্যয় জসীম

আলাভোলা বেশে-কার সাথে চলি নিত্য?
মানব জনমে আমি আমারই ভৃত্য।
বুঝিনা মানবমন... অভিমানের নীলানদ...
আমিতো ছিলাম ভালো... কখনো হইনি বদ।

স্বজনের হেলাফেলা চাতুরীর কোলাহল...
তুমূল একাকী আমি একাপথে চলাচল।
নিরবে নিরবে যাচ্ছি... সামনে কবর...
কখন কিভাবে যাবো জানিনা খবর।

আমিতো বহন করি আমারই শব!
একদিন থেমে যাবে জীবনের সব কলরব...।

ফেলে আসা জীবন

আনোয়ার কবির

নিজেকে নিজে প্রশ্ন করি
ফেলে আসা জীবনে কি আর ফেরা যায়
জবাবও পেয়ে যাই
ফেলে আসা জীবনে আর ফেরা যায় না
অতীতে আর ফেরা যায় না।

কখনো ধূলিধূসর আবার কখনো সোনালী ফ্রেমে
জ্বলজ্বল করা অতীত সামনে এসে দাঁড়ায়।
স্মৃতির অলিন্দের মুখেরা বারবার ফিরে আসে
ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে জানিয়ে যায় পুরনো হিসেব নিকেশ
কিন্তু অতীতে আর ফেরা যায় না।

অতীত পানে ফিরে দেখি
একখণ্ড আকাশ আমার সঙ্গে কথা বলতো
পথ চলতে চলতে আমার সঙ্গী হতো
আমি দাঁড়ালে দাঁড়িয়ে যেত সেও।

আজ আকাশ সমান উঁচুতে আমার মাথা ঠেকেছে
আকাশ হয়েছে স্থবির স্থির স্থানু
আর আমি বাড়তে বাড়তে
তালগাছের মতো শুধু দাঁড়িয়ে আছি।

ফেলে আসা জীবন ফেলে আসা দিন ফেলে আসা অতীত
শুধুই হাহাকার করে ফেরে!

মন্দ-ভালো সতর্কতায়

আ. শ. ম. বাবর আলী

কালো মেঘের মধ্যে থাকে মিষ্টি স্বাদের পানি,
সে মেঘ থেকে বৃষ্টি হলে জুড়ায় পরাণখানি।
সেই সে মেঘের মধ্যে আবার বিজলি ও বাজ থাকে,
হঠাৎ করে কেড়ে নিতে পারে পরাণটাকে।

সবুজ শ্যামল বন দেখে যে যায় জুড়িয়ে চোখ,
বনের শোভা দেখে উদাস হয় যে সকল লোক।
হিংস্র সব জীব-জানোয়ার সেই বনেতে থাকে,
ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপরে সামনেতে পায় যাকে।

শান্ত সুশীল নদী সাগর ঢেউ খেলে তার বুকে,
কী সুন্দর স্রোতের সাথে চলে যে সম্মুখে!
কিন্তু তাদের মধ্যে কত হাঙ্গর কুমির থাকে,
মওকা পেলে কামড়ে ধরে সামনেতে পায় যাকে।

মানুষেরই মধ্যে তেমন দুইটি গুণই আছে,
সাবধানেতে চিনে তবে যেও তাদের কাছে।
মন্দ হতে সাবধানেতে সতর্কতায় থেকো,
তার ভালো গুণ নিয়ে তারে বন্ধু করে রেখো।

সৃষ্টিকর্তার হুকুম

বাবুল তালুকদার

একদিকে রাক্ষুসী বন্যার ছোবল, অন্যদিকে মহামারি সারাবিশ্বে
সবকিছু যেনো পৃথিবী জুড়ে এলোমেলো
কঠিন পরিক্ষার ভেতর সারা পৃথিবীর মানুষ।
কোথাও শান্তি নেই, সারাবিশ্বে হট্টগোল লেগেই আছে
দুর্নীতি, অনিয়ম কোথাও থেমে নেই
পৃথিবী জুড়ে মানবতা আর ভালোবাসা নেই,
সবখানেই স্বার্থ লুকিয়ে,
অদিযুগের মানবের আস্তানায় ফিরে গেল মানুষ
না বুঝের মতো যা কিছু মনচায় তাই করে মুহূর্তেই
একোন অদ্ভুত খেলাচলে বিশ্বভুবনে।
সন্ত্রাসী, খুন, খারাবী, ধর্ষন, জুলুম চলে সারাবিশ্বে
কেউ কাউকে মানছেনা,
মিথ্যা অনাচার অত্যাচারে ডুবডুব সারা পৃথিবী
এ কোন খেলা সারা বিশ্বজুড়ে।
সবই তার হুকুমে হয়
বিচারের রায়ে ঝুলিয়ে দেয়
তবু বুঝতে চায়না মানুষ
আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যুগ যুগান্তর
নমরুদের আস্তানা সারাবিশ্বে ছড়িয়ে
কোথাও শান্তি নেই, স্বস্তি নেই, যেন নরকে চলে গেছে
কেয়ামতের আলামত দেখা যায় তবু মানুষ বুঝেনা
সবকিছু সৃষ্টিকর্তার হুকুমেই চলে বিশ্বভুবনে।

অনন্ত সংসার

শেখ দুলাল

যে পথে তুমি চলে গেলে
সেই পথেই আমি চলেছি
রিনিঝিনি মধুর সুরে
গান গেয়ে আষাঢ়ের ঝরনার মতো
প্রিয়াতিত গভীর গভীর ভালোবেসে
আয় আয় আমার অনন্ত ভালোবাসায়
গভীর ভালোবেসে ... বুকে আয়
এখানেই তোর জীবন কেটে
পৃথিবী থেকে বিদায় নিবে
অনন্ত দুয়ারে যে দুয়ারের সময় শেষ হবে না,
সেই দুয়ারে পৌঁছে দু'টি জীবন এক হয়ে
নতুন সংসার গড়ে তুলবে শেফালী রূপালী গান গেয়ে
এই অনন্ত সংসারের রঙিন যৌবন আর কোনোদিন ফুরাবে না
জন্ম মৃত্যুই আর কোনোদিনই হবে না
অনন্ত সোনালী সংসার হয়ে উজ্জিবিত হবে।

অসমতা

সৌম্য সালেক

ওরা জড়ো হয়েছিল বজ্রাঘাতে নিহত পাখিদের শোকে।

এরকম বিষয় যে কোনও বিশেষ কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ নেই কিংবা এমন অপঘাতের পরিত্রাণ প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন যে সময়সাপেক্ষ ব্যাপার ওরা এসব না ভেবেই নিজেদের উলঙ্গ করে রাজপথে নামিয়েছে!

চিৎকার চেঁচামেচি করতে করতে একের পর এক ওরা বলতে লাগলো : প্রকৃতির এসব অন্যায় আর মেনে নেয়া যায় না, এই নিষ্ঠুরতা সমূলে বন্ধ করতে হবে, আহত-নিহত সব পাখিদের জন্য শোক প্রস্তাবের পাশাপাশি দ্রুত যেন এ সংকট সমাধানে জাতিসঙ্ঘ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে; অন্যথায় আন্দোলন আরও ব্যাপক আকার ধারণ করবে এবং আপনি দেখবেন, এই নগ্ন-সমাবেশের বাইরে শহরে আর একজনও অবশিষ্ট নেই!

শ্রোতাদের কয়েকজন বলাবলি করছিল: পাখিদের জন্য ওদের ভালোবাসা দৃষ্টান্ততুল্য, এঁরাই প্রকৃত মানবতাবাদী, মঙ্গল হোক সবার।

ওদের বক্তব্যে অতি-মুগ্ধদের একজন ছিল নবীন সংবাদকর্মী, খুব আগ্রহের সাথে তিনি পাখিপ্রেমী সংগঠনটির মুখপাত্রকে জিজ্ঞেস করল: গতকাল সম্মিলিত বোমারু বাহিনীর হামলায় হালব ও বসরা'য় একশ একত্রিশটি শিশুর খুলি উড়ে গেছে, এ বিষয়ে আপনার দরদী কণ্ঠ থেকে কিছু শুনতে চাই।

মুহূর্তেই লোকটির সাংগঠনিক বদান্যতা উবে গেলো, সমানে নাক ও ভ্রু কুঁচকে খুব শিথিলভাবে একজন কূটনৈতিকের ভাষায় সে বলেছিল: এসব বিচ্ছিন্ন বিষয়ে আমাদের কোনও ভাষ্য নেই, আপনি বরং দক্ষিণে অবস্থিত ওই ধর্মশালাটির দিকে এগুন, মশাই!

নীল খামে চিঠি

মুহাম্মাদ আবদুল্লাহিল বাকী

তোমাকে দিয়েছি ফসলের বীজ চাঁদের কিরণ
তৃষ্ণা অনন্ত মোড়কে জড়ানো সুখের মিলন
তোমাকে দিয়েছি সূর্যের আলো প্রেমের ভুবন
কর্ষিত মাঠে শস্যদানার কর্ষিত যাপিত জীবন।

যোগ-বিয়োগ কঠিন হিসেব সন্ধ্যেবেলায়
তীর্যক বাণ হৃদ-মন্দিরে কাঁপন জাগায়
অবিশ্বাসের খোলা তলোয়ার আমাকে শাসায়
প্রাণঘাতী সেও, হুঙ্কারে তার কিবা এসে যায়।

যা কিছু দিয়েছি পেয়েছি কি তার সমপরিমাণ!
রাঙতা জড়ানো নীল খামে চিঠি বড় বেমানান।

নিয়তি

আবদুন নূর

গায়ের মেঠো পথের পাশে পুরোনো বটগাছটি বহুদিনের কালের স্বাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গত রাতে কাল বৈশাখী ঝড়ের সময় বজ্রপাতে গাছটি ডালপালাসুদ্ধ পুড়ে ভেঙ্গে পড়ে আছে। গাছটি ঘিরে কৌতুহলী মানুষের প্রচন্ড ভিড়। সে পথ দিয়ে যাবার সময় লোকেরা বললো : 'গাছের নিচে একজন লোক প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাত প্রসারিত করে পুড়ে মরে আছে।' ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলাম। লোকটিকে দেখে আমার চোখ কপালে উঠলো।

মনে পড়ে গতকাল দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর গরমে বাড়ির বাহির আঙ্গিনায় গাছের নিচে বসে আমরা ক'জন নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করছিলাম। বয়স আনুমানিক পঁঞ্চাশ কি ষাট মুখ ভর্তি দাড়ি গায়ে জীর্ণ পোশাকে লোকটি এসে আমাদের কাছে খাবার চাইলো। বললো : 'বাবারা! আমি অভুক্ত। আমাকে কিছু খেতে দিন।' কথাবার্তায় মার্জিত লোকটির প্রতি খুব মায়া হলো। বাড়ির ভেতর হতে থালার মাঝখানে ভাত রেখে পাশে তরকারি দিয়ে সামনে এনে রাখলে হাত ধুয়ে লোকটি খেতে বসলো। সে খুবই ক্ষুধার্ত তার খাবার গ্রহণে বুঝা যাচ্ছিল। খেতে খেতে বার বার পানি পান করছে। খাবার শেষ করে আমাদের কাছে এসে বসলো। বললাম : কথাবার্তায় আপনাকে শিক্ষিত ও ভদ্র মনে হয় কিন্তু আপনার জীবনের এ পরিণতির কথা কি আমাদের শুনাবেন? কিছুক্ষণ চুপ থেকে লোকটি বলতে শুরু করলো : সে অনেক কথা। তবু জীবন সায়াহ্নে আপনাদের সে কথা বলে যেতে চাই।

বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পূর্বাঞ্চলে এক গ্রামে আমার জন্ম। পিতার মুখে শুনেছি চাঁদপুর জেলার নদী ভাঙ্গন এলাকায় আমাদের পূর্ব-পুরুষদের বাস। বার বার নদী ভাঙ্গনে বাড়িঘর বদল করে দাদা আর্থিক ও মানসিকভাবে পেরেশান হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পূর্বাঞ্চলে বসতি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। সেই এলাকায় বসত বাড়ি খুঁজতে গিয়ে এক হিন্দু লোকের বাড়ির সন্ধান পান। হিন্দু লোকটির সাথে যোগাযোগ করলে তিনি জানান আত্মীয় স্বজন সবাই আগরতলা চলে গেছে; শুধু তিনি ভিটেমাটির টানে পড়ে আছেন। ভিটাবাড়ি ও জমাজমি বিক্রি করে তিনিও চলে যেতে চান। জমি ও বাড়ি কেনার কথা পাকা হলো। লোকটি একটি সাদা কাগজে টাকার অংকসহ সবকিছু লিখে দাদার হাতে দিয়ে বললেন : 'এটি রাখুন সময় মতো জমি ও বাড়ি রেজিস্ট্রি করে দেবো।' দাদা সমুদয় মূল্য পরিশোধ করে দিলে রাতের আঁধারে লোকটি আগরতলায় পাড়ি জমালেন। ঐ অবস্থায় দাদা তার একমাত্র পুত্র-পুত্রবধূ অর্থাৎ আমার পিতা-মাতাকে নিয়ে ঐ বাড়িতে এসে উঠলেন। দাদা ছিলেন বিপত্নীক। এই বাড়িতে উঠার পর দাদা বেশিদিন দুনিয়াতে ছিলেন না। এখানেই আমার জন্ম ও বেড়ে উঠা। পিতা আমার নাম রাখলেন– 'আবদুল মুযিল'। সারা জীবন দুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছনা-বঞ্চনার শিকার হয়ে শেষ জীবনে এক আলেমকে আমার নামের অর্থ জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এ নামের অর্থ হচ্ছে- 'লাঞ্ছনা দানকারীর বান্দা।' নামের অর্থ মানবজীবনে কম-বেশি প্রতিফলন হয় কি না জানি না। কিন্তু আমার জীবনে পুরোপুরি প্রতিফলন হয়েছিল। ছোট বেলায় মাকে মামার বাড়ি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেই মা খুবই বিষন্ন হয়ে যেতেন। বলতেন : 'এইটা যেমন তোমার বাবার বাড়ি, ধরে নাও এইটাই তোমার মামারও বাড়ি।'

আমরা ছিলাম নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার। খেয়ে পড়ে আমাদের দিনকাল ভালই যাচ্ছিল। আমি তখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় হঠাৎ গ্রামে কলেরা দেখা দিল। লোকেরা বলতো 'ওলা বিবি' দেখা দিয়েছে। ওরস্যালাইন তখনও আবিষ্কার হয়নি। চিকিৎসা ও প্রকৃত স্বাস্থ্য সুরক্ষা জ্ঞানের অভাবে গ্রামে বহু লোক মারা গেল। একদিন বিকালে আমার মা কলেরায় আক্রান্ত হলেন। বিনা চিকিৎসাতে রাত পোহাবার আগেই মা আমাকে বাবার হাতে তুলে দিয়ে আমাদের ছেড়ে পরপারে চলে গেলেন। আত্মীয়স্বজন-জানাশোনা এমন কেউ নেই যে, আমাদের দেখাশুনা ও রান্না করে দেবেন। বাবা সারাদিন মাঠে কাজ করে ঘরে ফিরে অভুক্ত থেকে নিজে রান্না করতে বসতেন। তাতে কখনও পিতার হাত পুড়ে, কখনও ভাত পুড়ে। তরকারি বলতে পানি দিয়ে সেদ্ধ করা তরকারি। তাতে কখনও নুন বেশি, কখনও মরিচ বেশি আর কখনও হয়ই না। আমি পিতাকে সাহায্য করতে চাইলেও পারতাম না। সেই ছোট বয়সেই না পারার দুঃখবোধ হৃদয়ে পীড়া দিত। নিজেকে নিজের কাছে অপরাধী মনে হতো। আমি এ খাবার কখনও খেতাম আবার কখনও না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম। পিতার হাসি-খুশি মুখ কোথায় যেন ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। বিষন্ন চেহারা। পিতার চোখে কোন কোন সময় পানি দেখেছি। রাতের বেলায় আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আমার মায়ের কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলতেন। পিতার সাথে আমি কান্নাকাটি করতাম। আমার কান্না দেখে পিতা কান্না থামিয়ে দিতেন।

দিন কারো জন্যে বসে থাকে না। এভাবে কষ্টের জীবন চলতে চলতে পিতা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। অবশেষে পিতা দু'একজনকে বলতে বাধ্য হলেন : 'আমি আর পারছি না। ভাবছিলাম বিয়ে না করে ছেলেটা বুকে করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবো কিন্তু এখন দেখছি সংসার চলছে না। আমার ছেলেটার দেখাশোনা করা ও দু'বেলা দু'মুঠো ভাত রান্নার জন্য একটা অতি সাধারণ ঘরের মেয়েকে আমার বউ হিসেবে এনে দাও।' বাবার বিয়ের জন্য মহিলা খুঁজে পেতে বেশি দেরি হলো না। এক মহিলা অকালে বিধবা হয়ে এক ছেলে সন্তানসহ অতি দরিদ্র ভাইয়ের আশ্রয়ে ঠাঁই পেয়েছে। ভাইয়ের অভাবের সংসার। নুন আনতে পান্তা ফুরায়। গরীব ভাইয়ের সংসারে বোন ও বোনের ছেলে বিরাট বোঝা হয়ে দেখা দিয়েছে। বোনকে বিদায় করতে পারলে ভাই বাঁচে। ভাইয়ের কাছে বোনের বিয়ের প্রস্তাব যেতেই ভাই রাজি হয়ে বিয়ের দিন তারিখও ঠিক করে ফেললেন। বিয়ের পূর্বেই পিতা সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানিয়েছিলেন যে, উনার বিয়ে করার প্রধান উদ্দেশ্য ছেলের অর্থাৎ আমার সেবাযত্ন করা, দু'বেলা দু'মুঠো ভাত রান্না করা; যাতে সারাদিন জমিতে কাজ করে এসে ডাল-ভাত খেতে পারে আর সংসারটা ঘুচিয়ে রাখা। কিন্তু বৌ হয়ে সৎমা আমাদের ঘরে এসে আমার মায়ের হাতে

সাজানো সংসার, ঘরের আসবাবপত্র সবকিছুই উনার পছন্দ হয়েছে; কেবল পছন্দ হয়নি আমাকে। আমার প্রতি উনার ব্যবহার ও কথাবার্তায় তা ফুটে উঠতো। দু'বছর পর তিনি আবার মা হলেন। আমার সেবাযত্ন নেয়ার উনার সময় ফুরিয়ে গেল। সংসারে অভাবের বোঝা দিন দিন বাড়তেই থাকে। এতো অভাবের মাঝেও পিতা আমার লেখাপড়া চালিয়ে নিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। গ্রীষ্মের ছুটিতে স্কুল বন্ধ। মাঠে প্রচুর কাজ। সময় পেলেই পিতার সাথে মাঠে কাজে যেতাম। কৃষি কাজে, খেত-খামারে সাহায্য করতে চেষ্টা করি। হালের একটা গরু এতোই দুর্বল যে জোয়াল কাঁধে নিয়ে হেঁটে যেতে পারছে না। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আমার মা বেঁচে থাকতে গ্রামের মধ্যে সবচে' বড় গরু ছিল আমাদের। মায়ের মৃত্যুর পর গরুগুলো কেমন শুকাতে থাকে। একদিকে জোয়াল কাঁধে গরু অন্যদিকে পিতা জোয়াল কাঁধে নিয়ে আমাকে লাঙ্গল ধরতে বলেন। বাধ্য হয়ে আমি লাঙ্গল ধরি। এভাবে লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করার পর জমিতে মই দেয়ার পালা। একদিকে জোয়াল কাঁধে গরু অন্যদিকে পিতার কাঁধে জোয়াল। আব্বা বললেন : 'তুই মইয়ে উঠে বসে আমাকে আর গরুকে চালিয়ে জমি মই দে।' আমার চোখে পানি এসে গেল। পিতাকে গরুর মতো করে জমি মই দিতে হবে। আমি কাঁদতে লাগলাম। আমার এমন বয়স ও শক্তি সামর্থ্য হয়নি যে, পিতাকে মইয়ে বসিয়ে আমি আর অন্যদিকে গরু মিলে মই টেনে দিতে পারবো। বাধ্য হয়েই পিতার কাঁধে জোয়াল দিয়ে আমি মইয়ে বসে জমি মই দিলাম। এ ঘটনা আরো ঘটেছে। সেই স্মৃতি সারাজীবনের জন্য মনের মধ্যে গেঁথে আছে। পিতা-পুত্র মিলে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে বাড়ি ফিরে দেখি ঘরে রান্নাবান্না কিছুই হয়নি। সন্তানের সেবাযত্ন করতে করতে সৎ মা দিন গুজার করে দিয়েছে। ক্ষুধার্ত পিতার চেহারা আজো চোখে ভাসে। মুঠো চাল চিবিয়ে ঢক ঢক করে আধা জগ পানি পান করলেন এবং আমাকেও এভাবে খেতে বললেন। ক্ষুধার জ্বালা সেদিন থেকেই ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলাম।

টাকার অভাবে বই কেনা হয়নি। সময় পেলে একই ক্লাশে পড়ে গ্রামের একজন ছাত্রের বাড়িতে গিয়ে ভাগাভাগি করে বই পড়তে চেষ্টা করতাম। সে যে বিষয়ে পড়াশোনা করতো, আমি অন্য বিষয়ে পড়ার চেষ্টা করতাম। মাঝে মাঝে হয়তো ছাত্রটি বিরক্ত হতো। এতো প্রতিকূলতার মধ্যেও পড়াশোনা চালিয়ে যেতে থাকি। কিন্তু স্কুলের মাসিক বেতন (টিউশন ফি) এবং পরীক্ষা ফি দিতে না পারায় পরীক্ষা দেয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকের কাছে আবেদন করলে বিষয়টি স্কুল পরিচালনা কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়। স্কুলটি বেসরকারি। সরকার হতে কোনরূপ অনুদান পায় না। শুধুমাত্র ছাত্রদের টিউশন ফি দিয়ে শিক্ষকদের বেতন ভাতাদি, স্কুলের গৃহনির্মাণ, চেয়ার টেবিল তৈরিসহ যাবতীয়

খরচ চালাতে হয়। দরিদ্র এলাকা। এমন কোন বিত্তবান লোক ছিল না যাদের আর্থিক অনুদানে বিদ্যালয়টি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব। পরীক্ষায় কোন ভাল ফলাফল করিনি; যাতে করে আমার টিউশন ফি মওকুফ করা যেতে পারে। এসব বিবেচনায় আমার মাসিক টিউশন ফি এবং পরীক্ষার ফি মওকুফের বিষয়টি বিবেচনা করলেন না। বাড়ি ফিরে রাতে পিতাকে বললাম : আব্বা আমার স্কুলের বেতন (টিউশন ফি) অনেক বকেয়া হয়ে গেছে। এত টাকা বকেয়া রেখে আমাকে সামনের পরীক্ষা দিতে দেয়া হবে না। কথা শুনে তিনি অনেক্ষণ চুপ রইলেন। কোন কথাই বলেননি।

বাড়িতে একখানি ঘর। মা বেঁচে থাকতে একাধিক ঘর ছিল। মায়ের মৃত্যুর পর দেনার দায়ে একটি মাত্র শোবার ঘর রেখে বাকি ঘরগুলো একে একে বিক্রি করে দেনা পরিশোধ করতে হয়েছে। সেই একটি ঘরে পাটখড়ির বেড়া দিয়ে ছোট একটি কক্ষ করে লেখা খাতার পাতা কাফিলা গাছের আঠা দিয়ে সেই বেড়াতে লাগানো হয়েছে। সেই ছোট্ট কুঠুরিতে পড়াশোনার জন্য একটি পুরাতন কাঠের তক্তার দুই পাশে দড়ি ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছিল। হাতল বিহীন একখানি চেয়ার, যার একটি পায়া নেই। চেয়ারের ভাঙ্গা পায়ার নিচে ইট দিয়ে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে, তাতেই কোন রকমে বসে কেরোসিনের কুপিতে রাতে পড়াশোনা করতাম। অনেক সময় পরিশ্রমে অল্পতে ঘুমের কোলে ঢলে পড়তাম। একদিন হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে শুনতে পাই পিতা ও সৎ মায়ের কথোপকথন। সৎ মায়ের আগের স্বামীর ছেলে নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে। তিনি বলছেন : 'আমার ভাইয়ের বাড়িতে ছেলেটার খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হচ্ছে। পড়াশোনা হচ্ছে না। তাকে এখানে নিয়ে এলে ভাল হতো।' পিতা চুপ করে আছেন। চোখের সামনে ভেসে উঠছে পিতার মলিন অসহায় চেহারাখানা। সৎ মা পিতাকে আবারো তাগাদা দিচ্ছেন : 'আপনে কথা বলছেন না কেন?' আমার ঐ ছেলে এখানে এলে খাওয়া দাওয়া ও লেখাপড়া ভাল হউক, তা বুঝি আপনি চান না।' 'না আমি বলছিলাম কি' বলেই পিতা আমতা আমতা করতে লাগলেন। 'কি বলতে চান বলুন।' 'বলছিলাম আমাদের এখানে তো পড়াশুনার আলাদা ঘর নেই। সংসারে অভাব অনটন লেগেই আছে। বছরে চৈত্র ও কার্তিক মাস না আসতেই ঘরে খোরাকি থাকে না। স্কুলে ছেলের মাসিক টিউশন ফি বাকি পড়ে আছে। এ সময় তোমার কিস্‌লু এলে কোথায় থাকবে, খাওয়া-দাওয়া কি হবে। এসব নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছি।' 'ও! আমার পেটের ছেলের খাওয়া-দাওয়া নিয়েই এতোসব চিন্তা? আমার কিস্‌লুর বাপ মারা যাবার আগে আমার হাতে কিছু টাকা পয়সা রেখে গেছে। ভাইজানের কাছে তা আছে। দরকার হলে এ টাকা এনে দেবো। যদি বলেন তবে কাল-পরশুই ভাইজানের বাড়িতে যাবো।' পিতা অনেক্ষণ পর বললেন : 'ফসলের ভাল জমিটা দেনার

দায়ে বন্ধকী আছে। যদি টাকাটা পাওয়া যায় তাহলে ঐ জমিটা হাতে এলে খোরাকির অভাব ঘুচে যাবে।' পিতা কিছুটা নিমরাজি হয়ে বললেন : 'তাহলে আগামীকালই যাও। দেখ টাকাটা পাওয়া যায় কি না।' পরদিন ভোরে উঠে সৎমা খাওয়া-দাওয়া করে কোলের সন্তানকে নিয়ে ভাইয়ের বাড়ির দিকে রওনা হলেন। সংসারের অবশিষ্ট প্রাণিদের খাওয়া-দাওয়ার কোন চিন্তাই তিনি করলেন না।

হাড়িতে কিছু পুরাতন পান্তা ভাত ছিল, তাই দু'টো শুকনা মরিচ পুড়িয়ে পেয়াজ দিয়ে পানিসুদ্ধ সেই ভাতটুকু বাপ-ছেলে খেয়ে নিলাম। দু'দিন পর ভাইয়ের বাড়ি হতে সৎমা আগের ছেলে কিস্‌লুসহ ফিরে এলেন। সঙ্গে কিস্‌লুকে দেখে আব্বা অবাক হলেন। বললেন : 'এতো তাড়াতাড়ি ভাইয়ের বাড়ি হতে চলে এলে? আরো ক'টা দিন ভাইয়ের বাড়িতে বেড়ায়ে আসতে পারতে। আর থাকা-পড়ার ব্যবস্থা না করেই তোমার ছেলে কিস্‌লুকে সাথে নিয়ে এলে?' 'ভাইয়ের বাড়িতে কিস্‌লুর থাকা-খাওয়ার অসুবিধা হচ্ছে। তাছাড়া এখানে কিস্‌লুর থাকার যখন সিদ্ধান্ত হয়েছেই, তাই আগেভাগেই তাকে নিয়ে এলাম।' আব্বা জিজ্ঞাসা করলো : 'থাকবে কোথায়, পড়াশোনার জায়গা কোথায়?' 'এখন আবদুল মুযিলের সাথে থাকবে-পড়বে। এরপর একটা ব্যবস্থা করে দিবেন।' 'টাকার কি ব্যবস্থা করলে?' 'অভাবে পড়ে ভাই টাকাগুলো খরচ করে ফেলেছে। পরে ব্যবস্থা করতে পারলে দিবে।' হতাশায় পিতা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

কিস্‌লুর বয়স বেড়েছে কিন্তু পড়াশুনা এগোয়নি। তারপরও মায়ের চাপে পিতা তাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। কিস্‌লু স্কুলে না গিয়ে বখাটেদের সাথে আড্ডা দেয়। রাতে না ঘুমিয়ে দল বেঁধে অন্যের বাড়ির ডাব, আনারস, শশা, আম-কাঁঠাল; যখনকার যে ফলমূল, তা চুরি করে খেতো। কখনও দূরবর্তী বাজারে বিক্রি করে টাকা পয়সা ভাগবাটোয়ারা করে নিত। তাদের চুরির ফলমূল আমাকে খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতো, আমি তা খেতাম না। কিন্তু মাঝে মধ্যে আধাপেট খেয়ে কখনও বা রাতে না খেয়েই থাকতে হতো। ঐ বয়সে খাবার লোভ সংবরণ করতে না পেরে তাদের সাধাসাধিতে দু'একদিন ওদের চুরির ফলমূল খেতে বাধ্য হয়েছি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক রাতে আমাকে জোর করে রাতে চুরিতে নিয়ে গেল। এক গৃহস্থের বাড়ির পাশে গিয়ে ফিসফিস কর আমাকে বললো : 'তুই তো ডাব গাছে ভাল চড়তে পারিস, ঐ যে ডাব গাছ; তাতে উঠে গাছের সাথে রশি বেঁধে পটাপট ডাবের ছড়া কেটে নিচের দিকে পাঠিয়ে দিবি, আমরা তা নিয়ে নেবো। দেখবি নিমেষেই অনেক ডাব পারা হয়ে যাবে। তারপর তুই তরতর করে নিচে নেমে আসবি।'

আমাকে জোর করে ডাব গাছে তুলে দিল। দুরু দুরু মন নিয়ে গৃহস্থের ঘরের পাশে ডাব গাছটিতে উঠে ডাব কেটে রশি দিয়ে গড়িয়ে নিচে ফেলতেই

ডাব গিয়ে পড়লো টিনের ঘরের চালে। সাথে সাথে বাড়ির লোকজন লাঠিসোটা ও আলো নিয়ে বেড়িয়ে এলো। দলের যারা নিচে ছিল সবাই গা ঢাকা দিলো। এতো উঁচু গাছ, না পারলাম লাফ দিতে, না পারলাম গাছ বেয়ে নিচে আসতে। অসহায়ের মতো গাছে বসে রইলাম। বাড়ির লোকজন আলোতে গাছের উপর আমাকে দেখে বললো : 'তুই! আমরা তো বিশ্বাসই করতে পারছি না, তোর মতো ছেলে রাতে পরের বাড়ির ফলমূল চুরি করিস্?' আমি যাই কিছু বলতে চাচ্ছি, তাদের কথার মাঝে কিছুতেই তা টিক্ছে না। গাছ হতে নেমে আসার পর আমার হাত পিছমোড়া করে গাছের সাথে বেঁধে রাখলো। বিকালে গ্রাম্য সালিসি বসলো। গ্রামের প্রায় প্রত্যেকের বাড়ি হতেই রাতে ফলমূল চুরি হতো। সবাই এসেছে নালিশ জানাতে। আমি ধরা পড়ার পর কিস্লু রাতেই মামাবাড়ি চলে গেছে আর অন্যরাও গা ঢাকা দিয়েছে। আামার সাথে চুরিতে কে কে ছিল এ কথা জিজ্ঞাসা করতে আমি যাদেরই নাম বলেছি, তাদের অভিভাবকরাই সাথে সাথে প্রতিবাদ করেছে। যেন আমি এতোদিন একাই সব ফলমূল চুরি করে খেয়েছি। সব শাস্তি আমার উপর অর্পিত হলো। কঠোর শাস্তির পর কোন রকমে বাড়ি এলে পিতা ডেকে বললেন : 'তোকে আমি এতো ভালোবাসি আর তুই কি না সারা গ্রামের নিকট আমার সম্মান মাটির সাথে মিশিয়ে দিলি।' মাথা নিচু করে চোখের পানি ফেলা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সৎমা বললেন : 'আমার কিস্লু কখনও এই কাজ করতে পারে না। তুই নিজকে বাঁচানোর জন্য আমার ছেলের নাম বল্ছিস।'

আব্বাকে রাতে নামাজ পড়ে কাঁদতে দেখেছি। রাগে অনেকদিন আমার সাথে ভাল করে কথাও বলেন নি। পিতার এ অবস্থা দেখে আমি মাঝে মধ্যে কাঁদতাম। একদিন আব্বা কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলো ঃ 'তোর কি হয়েছে?' আমি আব্বাকে সব কথা খুলে বললে তিনি খুব আফসোস করে বললে : 'হায়রে কপাল! হায়রে নিয়তি।'

পিতা অল্প শিক্ষিত হলেও রাজনৈতিক সচেতন ছিলেন এবং শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক-এর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। শেরে বাংলা যখন 'ঋণ সালিসি বোর্ড' ও 'প্রজাস্বত্ব আইন করেন পিতা ছিলেন সতের/আঠারো বছরের যুবক। তখন চাঁদপুরের চরাঞ্চলে বসবাস করতেন। আব্বা আমাকে গল্প শোনাতেন : 'শেরে বাংলা ফজলুল হক যদি 'ঋণ সালিসি বোর্ড' ও 'প্রজাস্বত্ব আইন' না করতেন তাহলে ঋণের দায়ে এদেশের কৃষকদের সমস্ত সম্পত্তি; এমনকি ভিটামাটি পর্যন্ত জমিদারদের দখলে চলে যেতো। কৃষককুল সর্বস্ব হারিয়ে ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিতে বাধ্য হতো। এদেশের কৃষকরা যদি নিজেদের গায়ের চামড়া দিয়ে শেরে বাংলার পায়ের জুতা বানিয়ে দিতো তাহলেও এ ঋণ পরিশোধ হবার নয়। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে শেরে বাংলার মনোনীত এলাকার প্রার্থী মাওলানা

আবদুল খালেক (র)-এর পক্ষে নির্বাচন প্রচারণা করেন। মাওলানা সাহেব জয়যুক্ত হন।

আব্বা আরো গল্প করতেন : 'সুচতুর আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসে এদেশের প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নিল এই বলে- পাকিস্তানের দুই অংশের মানুষেরা স্বল্প শিক্ষিত। যথাযোগ্য ব্যক্তিকে ভোটে নির্বাচন করতে পারবে না। তাই দুই অঞ্চলের চল্লিশ হাজার করে মোট আশি হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচিত হবে। এরা হবে প্রত্যেক ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। এই মৌলিক গণতন্ত্রীরাই নির্বাচন প্রহসন করে প্রেসিডেন্ট, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করতো।

১৯৬৫ সাল। আমি ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধী দলগুলো মিস ফাতেমা জিন্নাহ্‌কে ও সরকারি দল থেকে আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট পদ প্রার্থী হন। মৌলিক গণতন্ত্রীরা আইয়ুব খানের করতলগত ছিল বিধায় নির্বাচনে দুর্নীতি, অসাধুতার আশ্রয় ও প্রশাসনযন্ত্রকে অপব্যবহার করে আইয়ুব খান পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। আমাদের গ্রামে ছিল মৌলিক গণতন্ত্রীর (অর্থাৎ ইউনিয়ন কাউন্সিল চেয়ারম্যান) বাড়ি। ১৯৬৯ সনে গণ-অভ্যুত্থানে আইয়ুব খানের পতনের পর বিক্ষুব্ধ জনগণ সেই চেয়ারম্যানের বাড়িতে আগুন দেয়ায় কিছু আসবাবপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিক্ষুব্ধ জনগণের সাথে আমি থাকলেও আগুন দেয়া থেকে বিরত ছিলাম।

১৯৭১ সাল। স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হলে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের এলাকায় আসে। গোপনে তাদের সাথে যোগাযোগ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করি। কিন্তু আমার দেহের গঠন দেখে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। গ্রাম বাংলার ছেলে হিসেবে পানির নিচে দীর্ঘক্ষণ ডুবে থাকা এবং ডুব সাঁতারে অনেক দূর পাড়ি দেয়ার গুণ দেখে আমাকে গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে। আগস্ট মাস। বর্ষার পানি চারিদিক সয়লাব। জেলা সদরের সাথে একমাত্র যোগাযোগকারী সড়কের উপর কালভার্টটি আমাকে বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়। পাকবাহিনীর চলাচল ও রাজাকারদের টহলের মাঝখানে তাড়াতাড়ি করে বিস্ফোরক বাঁধতেই রাজাকাররা চলে এলো। কালভার্টের নিচে পানিতে কচুরিপানায় নাক জাগিয়ে পড়ে রইলাম। মাইন বিস্ফোরিত হয়ে কালভার্ট আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হলো। পাক সেনারা উপস্থিত হয়ে তা পর্যবেক্ষণ করে চলে যাওয়ার পর চারিদিক সুনসান। কিছুক্ষণ পর মনে হলো কে যেন আমাকে নাম ধরে ডাকছে। ভাবলাম সহযোদ্ধাদের কেউ আমাকে উদ্ধার করে নিতে এসে আমার নাম ধরে ডাকছে। কিন্তু আমার একবারও মনে হয়নি এ সময় এ পথ দিয়ে এসে আমাকে কেউ ডাকতে পারে না। পরে বুঝতে

পেরেছি-এ শোনা ছিল ভুল প্রহেলিকা। কালভার্টের নিকটে এসে পানি হতে ডাঙ্গায় উঠে জোরে ডাকলাম : আমি এখানে আছি। সাথে সাথে টহলরত রাজাকাররা এসে আমাকে ঘিরে ফেলল। সামান্য ভুলের কারণে কোন কোন মানুষকে চরম খেসারত দিতে হয়। আমার এ ভুলের জন্য বাকি জীবন অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। তখন আমার পরনে ছিল লুঙ্গি উল্টিয়ে মালকাছা মারা। আমাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে লাগলো। বললাম : আমি একজনের বাড়ির কামলা (দিন মজুর)। মনিবের আদেশে কালভার্টের নিচে মাছ ধরার জন্য চাঁই পেতেছি। আপনাদের কথাশুনে পানি হতে উঠে এসেছি। ভেবেছিলাম রাজাকাররা যদি পানির নিচ হতে চাঁই তুলে দেখতে বলে, তাহলে পানিতে নেমে এমন ডুব দেবো বহুদুর গিয়ে উঠে নিরাপদে চলে যাবো। কিন্তু আমার কোন বুদ্ধিই কাজে আসেনি। তবে আমার দেহের গঠন ও পরনের পোশাক দেখে আমার কথা ওরা বিশ্বাস করেছে বলে মনে হলো। কিন্তু এরই মধ্যে টহলরত পাক সেনাদের গাড়ি এসে আমাকে তুলে ক্যাম্পে নিয়ে গেল।

স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য আমার উপর অকথ্য অত্যাচার করলো। কিন্তু আমি কথায় অটল রইলাম। একজন বয়স্ক রাজাকার পাক সেনাদের বুঝাতে সক্ষম হয়েছে যে, আমি মুক্তিযোদ্ধা নই; রোজ কামলা। পাক সেনারা আমাকে দেশের উত্তরাঞ্চলে পাঠিয়ে দিলে সেখানে আমাকে রান্নাবান্নার কাজে নিয়োগ করলো। একাজে নিযুক্ত থেকে আমি প্রতিদিন তাদের কার্যাবলি লক্ষ্য করতাম। লুণ্ঠন করা গরু, ভেড়া, হাঁস-মুরগী তাদের খাদ্য তালিকায় থাকতো। পাকসেনারা রাজাকরদের নিয়ে দু'একদিন পর পরই কোথাও না কোথাও বের হতো কেরোসিন, দিয়াশলাই ইত্যাদিসহ। আর দিনের শেষে লুটতরাজ ও অন্যের বাড়িঘর জ্বালিয়ে তারা ফিরতো। কখনও কখনও মহিলাদের ধরে নিয়ে আসতো। গভীর রাতে পাকসেনাদের ক্যাম্প হতে মহিলাদের ক্রন্দনধ্বনি শুনে অলক্ষ্যে চোখের পানি ফেলতাম। এভাবে দিন কেটে যায়। একদিন এদের ক্যাম্প হতে পালাতে গিয়ে পাহারারত পাকসেনাদের হাতে ধরা পড়ে অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। 'আমি যাই বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে।'

নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি। পাকসেনাদের চোখেমুখে ভীতির ভাব লক্ষ্য করি। অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকাতে পাকবাহিনী যৌথবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করলো। এর দুদিন পর এই ক্যাম্পের পাক সেনারা যৌথ বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করলো। ভারতীয় সৈন্যরা পাকসেনাদের নিয়ে গেল আর রাজাকারদের দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া হলো মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে।

আমি ছাড়া এই ক্যাম্পের অন্যান্য রাজাকাররা ছিল স্থানীয়। পাকসেনাদের ঘাঁটির আশেপাশেই ছিল এদের বাড়িঘর। এরা ছিল খুবই সুচতুর। মুক্তিযুদ্ধের

শেষের দিকে পাকবাহিনীর নিশ্চিত পরাজয় বুঝতে পেরে এরা স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে শুরু করে। স্থানীয় রাজাকাররা আগেই সংবাদ পাঠিয়ে বাড়িতে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট আত্মসমর্পণ খেলা করেছে অনেকেই। মাঝে মধ্যে ক্যাম্পের পাকসেনাদের সম্পর্কে সত্য-মিথ্যা তথ্য গোপনে বিভিন্নভাবে প্রেরণ করে মুক্তিযোদ্ধাদের আস্থা অর্জন করেছে। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও রাজাকার হয়ে গেলাম। কার্লভাটের নিচ হতে পাক-সেনাদের নিকট ধরা পড়ার পর আমাকে নিজ জেলা থেকে ভিন্ন জেলায় প্রেরণ করে। আমি যেসব মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট ট্রেনিং নিয়েছিলাম পরবর্তিতে বিভিন্ন সম্মূখযুদ্ধে তারা প্রায় সকলেই শহীদ হয়েছে। আমাকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে শনাক্ত করার কেউ ছিল না। পাকসেনা ক্যাম্প হতে রাজাকার হিসেবে গ্রেফতারের পর আমাকে অনেক মারধর করা হয়। এতে আমার ডান হাতটা বাকি জীবনের জন্য অবস হয়ে যায়। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর জেল হতে ছাড়া পাই কিন্তু বাড়ি ফেরার মত একটি পয়সাও আমার কাছে ছিল না। বিভিন্ন জায়গা কামলা খেটে, রিক্সা চালিয়ে, ইটের ভাটায় কাজ করে ক'টা পয়সা হাতে নিয়ে পিতাকে দেখবো বলে বড় আশা করে বাড়ির পথে পা বাড়ালাম। মানুষ ভাবে এক কিন্তু ভাগ্যে লিখা থাকে অন্য।

গ্রামে এসে লোক মুখে শুনলাম আমাদের ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মুক্তিযুদ্ধের সময় এলাকায় শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের চেয়ারম্যানের বাড়ি পোড়াতে যারা ছিল, শান্তি রক্ষার নামে পাক সেনাদের ডেকে এনে ঐসব লোকদের বাড়িঘর পুড়িয়ে, মানুষ হত্যা করে কড়ায় গন্ডায় প্রতিশোধ নিয়েছে। 'ছেলে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছে'-এই অপরাধে আমার পিতাকে পাক-সেনাদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। পাকসেনারা পিতাকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে খালের পানিতে ফেলে দিয়েছিল। সৎমা আগেই সন্তান নিয়ে তার ভাইয়ের বাড়িতে চলে গিয়েছিল। রাজাকাররা ও পাকসেনারা গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগী ইত্যাদি লুঠতরাজ করে আমাদের বাড়িঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

দেশ স্বাধীন হবার পর আমার সৎমা আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে এসে পোড়া বাড়ির ভিটা ও অবশিষ্ট জমি-জিরাত অন্যের নিকট পানির দরে বিক্রি করে টাকাপয়সা নিয়ে চলে যান। যাদের নিকট জমি বন্ধক ছিল, তারা সেইসব জমি দখল করে নিজের নামে লিখিয়ে নিলেন। বাড়ির বাইরে একটি আম গাছ ছিল। এর ছায়ায় শেষবারের মতো কিছুক্ষণ বসে মা-বাবার স্মৃতি মনে করে অনেক্ষণ কেঁদে অজানার উদ্দেশ্যে পা বাড়ালাম। সারা পৃথিবী আমার জন্য উন্মুক্ত কিন্তু কোথাও মাথা গোঁজার ঠাঁই রইল না।

কোন বিশেষ কাজও জানি না। পড়ালেখার সার্টিফিকেট নেই। ডানহাতটি অব্স থাকায় এক হাতে ভারী কোন কাজও করতে পারি না। কি করি। বেঁচে থাকার তাগিদে শেষ পর্যন্ত রিক্সা চালাবো বলে ঠিক করলাম। কিন্তু আমার এক হাত অব্স বলে রিক্সা মালিকেরা আমাকে রিক্সা দিতে চায় না। এক মালিককে অনুরোধ করে একটি রিক্সা নিয়ে ভাড়া বাইলাম। কিন্তু বেশিদিন রিক্সা চালাতে পারিনি। যক্ষায় অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে যাই। সুস্থ হবার পর ডাক্তার পুষ্টিকর খাবার খেতে বললো। কোথায় পাবো পুষ্টিকর খাবার। এরপর একহাতে মুটেগিরি ও ইটভাটায় কাজ করেছি। শরীরে যখন আর কুলায় না, মনের বিরুদ্ধে ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিলাম। ভিক্ষা করে চাল পেলেও কে ভাত রান্না করে দেবে, কোথায় তরকারি পাব? কোনদিন একবেলা খেতে দিলে ভিক্ষার চাল অন্য কোন দুঃখী মানুষকে দিয়ে দেই। কখনও কখনও শুধুমাত্র একমুঠো চাল চিবিয়ে দুই/এক গ্লাস পানি খেয়েই দিন কাটিয়ে দেই।' এ পর্যন্ত বলে লোকটি অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো। আসরের নামাজ পড়তে চাইলে বাড়ির ভিতর হতে একটি লুঙ্গি এনে দিলাম। নামাজ পড়ে চা-বিস্কুট খেলেন। রাতে খাওয়ার অনুরোধ করলাম। বললো ঃ 'দিনে একবারই খাই।'

এক সময় গুনগুন করে গেয়ে উঠলোঃ

'দয়াল ভাল তুমি বাস যারে
কাঁদাও তারে অকূল পাথারে॥'

জীবনভর যে এত দুঃখ কষ্ট করেছে, তারঁ মুখে এ গান শুনে অলক্ষ্যে আমার চোখ দিয়ে পানি এসে গেল। মাগরিবের নামাজ পড়ে বিদায় নেয়ার আগে আবারো গুনগুন করে গাইলেন : 'বিধিরে! এ জগতে আমার নালিশের জায়গা নাই রে।'

সন্ধ্যার পর আমাদের বাড়ি হতে বের হয়ে গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন। পথে ঝড় বৃষ্টি শুরু হলে অনুমান করি এই বটগাছের নিচে লোকটি আশ্রয় নিয়েছিল। নিজের নিয়তির কথা ভেবে স্রষ্টার কাছে হাত তুলে যেই মুহূর্তে প্রার্থনা করছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে গাছে বজ্রপাত হলে বজ্রপিষ্ট হয়ে লোকটি মৃত্যুবরণ করেছে। লোকটির নিয়তির কথা চিন্তা করে নিজের অজান্তেই অন্তর হতে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। ♦

সং | গ | ঠ | ন |

মুসলিম সাহিত্য সমাজ

আখতার হামিদ খান

মুসলিম সাহিত্য সমাজ-এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আজ থেকে ৮৪ বছর আগে ১৯২৬ সালের ১৯ শে জানুয়ারি। জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে কতিপয় প্রগতিশীল মুসলিম তরুণের ঐকান্তিক প্রয়াসে। মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠার পেছনে যৌক্তিক কারণ ছিল। বাঙালি মুসলিম সাহিত্যিকদের মধ্যে চিন্তা-চেতনায় যারা অত্যন্ত প্রাগ্রসর ছিলেন, তারাই সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠার পেছনে মূল ভূমিকা পালন করেন। প্রতিবেশী হিন্দু সমাজে পরিবর্তনের যে প্রচণ্ড ধাক্কা লেগেছিল, তা তরুণ মুসলিম সাহিত্যিকদের নিজ সমাজ উন্নয়নে ভাবিয়ে তুলেছিল। তারা চেয়েছিলেন সমাজকে জাগিয়ে তুলতে। কুসংস্কার, পশ্চাৎমুখিতা ও সকল প্রকার কূপমণ্ডুকতার বেড়াজাল থেকে মুসলিম সমাজকে আলোর পথে, কল্যাণের পথে ডাক দিয়েছিল সাহিত্য সমাজের কর্মীরা। সকল প্রকার ধর্মীয়

গোঁড়ামিমুক্ত হয়ে এবং ধর্মকে বৈজ্ঞানিক সত্যের নিরিখে পরখ করে নিতে তারা অভিযান শুরু করেন। মুসলিম সাহিত্য সমাজের নামের শুরুতে 'মুসলিম' শব্দটি থাকলেও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই ছিলেন উদার ধর্মীয় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও নির্ভেজাল অসাম্প্রদায়িক। তাঁরা ছিলেন সার্বজনীনতা ও বিশ্ব মানবিকতাবোধের ধারক ও বাহক। একটি ঐতিহাসিক সত্য কোনোভাবে অস্বীকার করার উপায় নেই। ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকার Divide and Rule. পলিসি কিংবা রাজনৈতিক/প্রশাসনিক যে কারণেই বাংলা বিভাগ করে থাকুক না কেন-তা পূর্ব বাংলার বিপুল মুসলিম জনগোষ্ঠীর মনে প্রভূত আশার সঞ্চার করেছিল। পূর্ব বাংলা ও আসামকে নিয়ে যে নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়েছিল, তাতে মুসলমানদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, কলকাতাকেন্দ্রিক আর্থ-প্রশাসনিক ব্যবস্থার কারণে এ অঞ্চলের জনগণ শিক্ষা-দীক্ষায় ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মারাত্মকভাবে পিছিয়ে ছিল। পূর্ব বাংলায় ছিল বিপুল উর্বরা ভূ-সম্পত্তি। ১৭৭৩ সালে ব্রিটিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিপ্রেক্ষিতে এ অঞ্চলের জমিজমার মালিক হয়ে পড়েন হিন্দু ভূ-স্বামীগণ। তাদের প্রায় শতভাগ কলকাতা প্রবাসী হওয়ার কারণে পূর্ব বাংলায় উৎপাদিত সম্পদ থেকে সঞ্চিত অর্থ কলকাতায় চলে আসে। ঐ অর্থ খরচ হতো কলকাতা প্রবাসী জমিদারদের আরাম-আয়েশের জন্য। সে কারণে বলা যায় পূর্ব বাংলা অনেকটা কলকাতার বিত্ত-বৈভব বৃদ্ধির উৎসভূমি হয়ে দাঁড়ায়। 'বিভাগপূর্ব বাংলার রাজনীতি ও সমাজ' গ্রন্থে প্রেমেন আডি ও ইবনে আজাদ লিখেছেন- ১৭৭৩ সালে প্রবর্তিত কোম্পানির ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এমন ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি করল যার শোচনীয় পরিণতির নিদর্শন আজও পর্যন্ত বাংলার গ্রামে গ্রামান্তরে দৃষ্ট হয়। বাংলার বড় বড় শহরগুলোর ক্রমাবনতি, আর কলকাতার উত্থান-উন্নতিকে এক অর্থে বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের পরিমাপক হিসেবে গণ্য করা চলে। যে ঢাকা নগরী বর্ধিষ্ণু বয়নশিল্পের এক বিরাট কেন্দ্র ছিল, তার স্পষ্টতই অবনতি ঘটতে শুরু করল। ১৭৬৫ সালে এই নগরীর লোকসংখ্যা ছিল সাড়ে চার লাখ; ১৮০০ সালের মধ্যেই সেই সংখ্যা এসে নামল মাত্র বিশ হাজারে'। অনুরূপ প্রেক্ষাপটে দীর্ঘদিন পর পূর্ব বাংলা ও আসামকে নিয়ে নতুন প্রদেশ গঠিত হলে প্রদেশের অধিবাসীদের মনে প্রবল আশা সৃষ্টি হয়। ঢাকা নতুন প্রদেশের রাজধানী হওয়ায় এখানে শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করো পূর্ব বাংলার গ্রামে-গঞ্জে শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের কাজটি বেশ উদ্যমের সাথে চলতে থাকে। এ প্রদেশের বঞ্চিত জনগণ সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনায় ব্যাপক সাড়া দিয়ে নিজেদের উন্নতি

সাধনে সচেষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে, বাংলার মুসলিম নবজাগরণের বীজটি ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে একটি নতুন প্রদেশ গঠনের মধ্যেই নিহিত ছিল। অবহেলিত মুসলিম জনগোষ্ঠী আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে। তাদের সন্তান-সন্ততিরা স্কুলমুখি হয়। বলা যেতে পারে পূর্ব বাংলায় জাগরণের সুবাতাস বইতে শুরু করে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য বাংলার হিন্দু জনগোষ্ঠী বাংলা বিভাজনকে কোনোভাবে মেনে নিতে পারেনি। কলকাতার ধনিক, বণিক ও জমিদার শ্রেণি পূর্ব বাংলায় তাদের বিশাল জমিদারি হাতছাড়া হবার আশঙ্কায় যারপর নাই ক্ষুব্ধ হয়। হিন্দু দর্শনে দেশকে মাতৃসম ভাবা হয়ে থাকে। কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু বুদ্ধিজীবীগণ এ আন্দোলনে ধর্মীয় অনুভূতির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে জাগরিত করার প্রয়াস পায়। ২২ শে অক্টোবর ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আদেশ কার্যকর করার কথা ছিল। ঐ দিন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকারীরা গঙ্গাস্নান সেরে শক্তির দেবী কালীর সম্মুখে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে নিজেদের আত্মোৎসর্গ করবে বলেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল। The Hindu Patriot নামক একটি পত্রিকা ২২ শে সেপ্টেম্বর ১৯০৫ সালে ঘোষণা করে– এই আন্দোলনে ধর্মীয় অনুভূতির অনুপ্রবেশ একটা শক্তিশালী উদ্দীপক হিসেবে কাজ করবে এবং এটাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে সাহায্য করবে। কারণ, এদেশে ধর্মের চেয়ে অন্য কোনো কিছু অত সহজে জনগণের মনে নাড়া দিতে সক্ষম নয়। বাংলার বিপ্লববাদী দলগুলো বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সহিংস ও সশস্ত্র আন্দোলনে নেমে পড়ে। ব্রিটিশ সরকার প্রচণ্ড আন্দোলন ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মুখে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রহিত ঘোষণা করে। ১৯০৫ সালে নতুন প্রদেশ সৃষ্টি ও পরবর্তীতে ১৯১১ সালে তা বাতিল হলে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের আত্ম উন্নয়নের তাগিদ সৃষ্টি হয়। বাংলা বিভাগ রদ হলেও ইতোমধ্যে প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় অনেক স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছিল। আরো একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, প্রাদেশিক রাজধানী কলকাতায় স্থানান্তরিত হলেও বাংলার বড়ো লাট বছরের একটি সময় দাপ্তরিক কাজ-কর্ম ঢাকায় সম্পাদন করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। প্রতিশ্রুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়েছিল। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায় ইতিপূর্বে সরকারি চাকরি-বাকরিতে সুবিধালাভ, জমিদারি অর্জনসহ যা-যা সুবিধা লাভ করা যায়, ব্রিটিশের সুনজরে থেকে তার সবটুকু আদায় করে নিয়েছিল। এখন তাদের মধ্যে অতি প্রগতিশীল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে সাম্য, স্বাধীনতার দাবি উঠতে থাকে। এটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের

গাত্রদাহের কারণ ছিল। ব্রিটিশ চিরাচরিত নিয়মে মুসলিম সম্প্রদায়কে কাছে টেনে নেয়ার নীতি গ্রহণ করে। শিক্ষা-দীক্ষায় পশ্চাৎপদ মুসলমানগণ স্বভাবতই এগিয়ে আসে। যার ফলশ্রুতিতে, বিংশ শতাব্দীর শুরুতে শিক্ষিত মুসলিম তরুণেরা সরকারি চাকরি, শিক্ষা বিভাগ সহ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের চাকরিতে ঢোকার সুবিধা অর্জনে সক্ষম হয়। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে অবস্থার আরো উন্নতি হয়। বলা যেতে পারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বাঙালি মুসলমানের রেনেসাঁর পথটি মসৃণ করে দেয়।

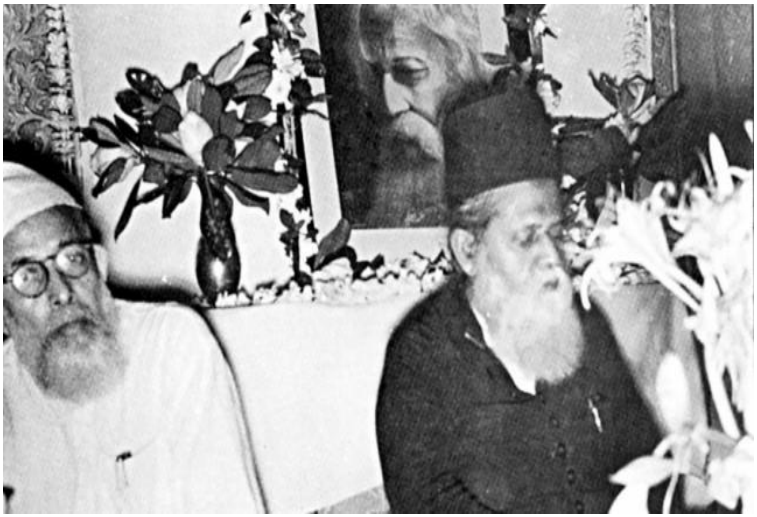

একটি অনুষ্ঠানে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও ড. কাজী মোতাহার হোসেন

মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রাণপুরুষ ছিলেন অধ্যাপক আবুল হুসেন। তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষক। তাঁর প্রধান সহযোগীদের মধ্যে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যাপক কাজী আব্দুল ওদুদ, কাজী আনোয়ারুল কাদির, অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির ছাত্র আবুল ফজল সাহিত্য সমাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। পরবর্তীতে এ সংগঠনের সাথে আরো অনেকে যুক্ত হন। বাঙালি মুসলমানদের জীবনে যেটুকু অসুন্দর, যেটুকু অমঙ্গল এবং যেটুকু জরাজীর্ণতা, তার সবটুকু। নির্দয় আঘাতে বিদূরিত করে সত্য ও সুন্দরের সাধনায় নিয়োজিত করতে সাহিত্য সমাজ প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়ে যায়। সাহিত্য সমাজের মুখপত্র ছিল 'শিখা'। শিখা পত্রিকায় যারা লিখতেন, বাংলা সাহিত্যে তারা 'শিখা গোষ্ঠী' নামে পরিচিতি লাভ করেন। সাহিত্য সমাজের অধিবেশনগুলোতে যে সমস্ত অভিভাষণ দেওয়া হতো, প্রবন্ধ পাঠ করা হতো, তা

'শিখা'য় প্রকাশ করা হতো। 'শিখা'র মুখবাণী ছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এর সে প্রবচন– 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'।

সাহিত্য সমাজ জন্মের পর দশ বছরের অধিককাল টিকে ছিল। এ সময়কালের মধ্যে ৫০টির বেশি সাধারণ অধিবেশন ও ১০টি বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনসমূহে সমাজ সংস্কার বিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ পাঠ করা হতো। পঠিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা/সমালোচনা হতো। আবৃত্তি, গান ইত্যাদি অনুষ্ঠানের অনুষঙ্গ থাকত। একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, সাহিত্য সমাজের প্রতিটি অনুষ্ঠানে একজন বরেণ্য সাহিত্যিককে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে মনোনীত করা হতো। রেওয়াজ মাফিক তিনি একটি অতি মূল্যবান অভিভাষণ দিতেন। সমিতির দশটি অধিবেশনে মোট দশ জন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব জাগরণীমূলক বক্তব্য রেখেছিলেন। প্রথম অধিবেশনে অভিভাষণ দিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের স্বনামধন্য শিক্ষক স্যার এ. এফ. রহমান। ১৯২৭ সালের ২৭ ও ২৮ শে ফেব্রুয়ারি এ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনের সাধারণ সভাপতি ছিলেন খান বাহাদুর তসদ্দক আহমদ। মুসলিম সাহিত্য সমাজের মূল লক্ষ্য ছিল বঙ্গীয় মুসলিম সমাজকে আধুনিক চিন্তা-চেতনায় উজ্জীবিত করা। পারিপার্শ্বিক হিন্দু সমাজের জাগরণী শক্তি তাদের আন্দোলিত করেছিল। পাশাপাশি স্ব-সমাজের পশ্চাৎমুখীতা মুসলিম সাহিত্য সমাজের কর্ণধারদের কিছু একটা করার জন্য প্রবলভাবে তাড়িত করে। সমাজের প্রতি তাদের এই দায়বদ্ধতা সত্যিই প্রশংসার। মুসলমান সমাজে যা কিছু অন্যায়, অসুন্দর ও অকল্যাণকর তারা অকপটে তার সমালোচনা করেছেন। সাহিত্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতাগণ ইসলাম ধর্মের উদার ও বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী ছিলেন। ধর্মীয় জীবনে যুক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাদের অন্যতম ব্রত। ইসলামের ইতিহাসে যে সমস্ত মনীষী মুক্ত চিন্তার অনুসারী ও যুক্তিবাদের প্রবক্তা ছিলেন, তাদের চিন্তাচেতনা প্রচার ও প্রসারের জন্য সাহিত্য সমাজ আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যান। সত্যি কথা বলতে কি, ইসলামের যুক্তি নির্ভর শাস্ত্র ব্যাখ্যার প্রচলন শুরু হয় মোতাজেলা সম্প্রদায়ের উদ্ভবের পর থেকে। পরবর্তীতে বিভিন্ন মুক্তবুদ্ধির অনুসারী দার্শনিকগণ ইসলামের উদার নৈতিক চিন্তা-চেতনার বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। দার্শনিক আল রাজি (৮৬৫-৯২৫), সৈয়দ জামাল উদ্দীন আফগানী (১৮৩৯-১৮৯৭), মিশরের মুফতি মুহম্মদ আবদুহ (১৮৪৯-১৯০৫), ভারতের জাস্টিস স্যার সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮), আলীগড়ের স্যার সৈয়দ আহমদ (১৮১৭-১৮৯৮), মাওলানা আবুল কালাম আজাদ (১৮৮৮১৯৫৮) প্রমুখ মুসলিম চিন্তাবিদগণ যুক্তি ও বুদ্ধির আলোকে ইসলামের মর্মমূলে পৌঁছা ও তার নির্যাস বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার চেষ্টা

করেছিলেন। ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের অগ্রনায়কগণ সত্যিকার অর্থে আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনার সংমিশ্রণে ইসলামের উদার নৈতিক ও যুক্তি নির্ভর ধারাটির পরিপুষ্টি, প্রচার ও প্রসারের চেষ্টা করেছিলেন। তারা ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী।

বাংলা সাহিত্যে শিখা গোষ্ঠীর একটি নিজস্ব আসন রয়েছে। শিখা গোষ্ঠীর আন্দোলনকে 'মুক্তিবুদ্ধির আন্দোলন' নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। বিশিষ্ট পণ্ডিত ড. শিবনারায়ণ রায় তার A New Renaissance 978-The Sikha movement (19271932): A note on the Bengali Muslim Intelligentsia in Search of Modernity' প্রবন্ধে বাঙালি মুসলমানের নবজাগরণের অগ্রদূত হিসেবে শিখাকে চিহ্নিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে শিখা বিকাশমান বঙ্গীয় মুসলিম জনগোষ্ঠীর হৃদয় আলোকিত করার প্রয়াস চালিয়ে ছিল। মুসলিম সাহিত্য সমাজের সাথে 'সাহিত্য শব্দটি সংযুক্ত থাকলেও এটি প্রকৃত অর্থে নিছক কোনো সাহিত্য সংগঠন ছিল না। এটি মূলত ছিল সমাজ অনুশীলন কেন্দ্র। এটিকে সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবন চিন্তা কেন্দ্র নামে সংজ্ঞায়িত করা সমীচীন হবে। বাংলা ১৩৩৩ সালের চৈত্র সংখ্যায় শিখার প্রকাশকের নিবেদনে বলা হয় 'শিখার প্রধান উদ্দেশ্য বর্তমান মুসলমান সমাজের জীবন I The mainecome a pihey fully accli Muslims চিন্তাধারার গতির পরিবর্তন সাধন। শিখার প্রথম সংখ্যায় আমরা যে প্রবন্ধগুলো সন্নিবেশ করেছি, তার প্রত্যেকটি সমাজের দারুণ অভাবের এক একটি দিক লক্ষ্য করে লিখিত হয়েছে। মুসলিম সাহিত্য ও তার মুখপত্র শিখার মূল উদ্দেশ্যই ছিল আধুনিক প্রগতিশীল চিন্তা বিকাশের পটভূমিকায় বুদ্ধি, জ্ঞান ও যুক্তির আলোকে বাঙালি মুসলিম সমাজের সমকালীন সমাজ চিন্তা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের বিজ্ঞানভিত্তিক বিচার বিশ্লেষণ করে তাকে কালোপযোগী করা ও আধুনিক জীবনবোধের সাথে সম্পৃক্ত করা। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট গবেষক এস এম আলী লিখেছেন 'The main problem before the Muslim intellectuals was how to become a part of the modern work while remaining Muslims? They fully accepted the need of a change in the outlook of the Bengali Muslims.' আসলে মুসলিম সাহিত্য সমাজ বাংলার মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটানোর গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিল; সকল প্রকার অপশক্তির ক্রুদ্ধ থাবা থেকে মুক্ত করে তাদেরকে প্রগতির পথ উপহার দেবার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। সাহিত্য সমিতির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে যোগদানের আমন্ত্রণপত্র পেয়ে কবি জসীমউদ্দীন শিখার সম্পাদককে যে আবেগঘন পত্র লিখেছিলেন– সমকালীন প্রতিক্রিয়া বোধগম্যতার স্বার্থে আমরা নিম্নে তার কিয়দংশ তুলে ধরছি- 'আপনাদের সাহিত্য সমাজকে আমি সাহিত্য সমাজ

হিসেবেই ধরি নে। মানুষের দুর্দিনের ইতিহাসের পশ্চাতে মানুষের মুক্তির দেবতা শবসাধনা করেন।

আজ বঙ্গ মুসলিমের সমাজ আঙিনায় শশ্মানের প্রেতাযাগিনীর তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হয়েছে। কোন দেবতা আজ এই ঘোর অমানিশার অন্ধকারে কুহেলি কুহরে জাতির মুক্তিমন্ত্র রচনা করছেন তাকে আমরা দেখিনি। তবু মনে হয় আপনাদের ভিতর যেন সেই দেবতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছেন। তাকে যেন আপনারা চিনেছেন। একদিন আপনাদের আহ্বানে সেই দেবতা এসে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হবেন। আমরা সেই দিনের অপেক্ষায় পীড়নের, দুঃখের, বেদনার মন্দির সাজিয়ে বসে থাকি। সাহিত্য সমাজ কঠিন আঘাত করে বাঙালি মুসলিম সমাজকে জাগরিত করতে চেয়েছিল। জীর্ণপ্রাণের আবর্জনা মুক্ত করে তাদেরকে প্রাণচাঞ্চল্যে উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছিল। সৃষ্টি করতে চেয়েছিল নতুন চিন্তার, নতুন মতের, নতুন পথের। তাই দেখা যায়, সাহিত্য সমাজের পথিকৃৎ আবুল হুসেন, কাজী আব্দুল ওদুদ, আবুল ফজল, কাজী আনোয়ারুল আজিমসহ অন্যান্যরা যেভাবে সমাজ, ধর্ম, জীবনের অসামঞ্জস্য বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং প্রতিকারের পথ নির্দেশনা দিয়েছেন, তা গ্রহণ করার পর্যায়ে বাঙালি মুসলিম তখনো পৌঁছাতে পারেনি। বিশেষত ঢাকা কেন্দ্রিক সেকেলে চিন্তার ধারক-বাহক স্থানীয় মুসলিম সমাজপতিদের ওপর মুসলিম সাহিত্য সমাজীদের চিন্তা চেতনা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বিশেষ করে বঙ্গীয় মুসলিম সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে যে প্রগতিশীল চেতনার বশবর্তী হয়ে তারা সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, বাঙালি মুসলিম আপামর জনগোষ্ঠীর কাছে সে বাণী পৌঁছানোর সেতুবন্ধ তখনো তৈরি হয়নি। ঢাকার মুসলিম সমাজপতিরা সাহিত্য সমাজের উচ্চমার্গীয় চিন্তা-চেতনা অনুধাবন করার মতো লেভেলে তখনো পৌঁছতে পারেননি। অধিকন্তু, মাওলানা আকরম খাঁ'র সাপ্তাহিক মোহাম্মদী গ্রুপ সাহিত্য সমাজীদের অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সমালোচনা করা শুরু করে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অধ্যাপক আবুল হুসেন 'নিষেধের বিড়ম্বনা', 'শতকড়া পঁয়তাল্লিশ', ও 'সত্য' শীর্ষক তিনটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৯২৫ সালের জুনে আবুল হুসেন 'তরুণ পত্র' নামে একটি পত্রিকা বের করেন। উক্ত পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে তিনি লিখলেন 'মানুষের যথার্থ কল্যাণ হয় জানে। কেহ কেহ বলিবেন ধর্মে। কিন্তু জ্ঞানহীন ধর্ম অর্থবিহীন। সুতরাং বলিব, মানুষের মুক্তি হয় জ্ঞানে। এই জ্ঞান প্রচারেরই সংকল্পে তরুণ পত্রের সৃষ্টি। আগ্রহী পাঠকের স্পৃহা নিবৃত্তির জন্য কাজী আব্দুল ওদুদ-এর সম্মোহিত মুসলমান প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করছি– '....আমাদের চিত্তে বল সঞ্চার করুক এই নব বিশ্বাস যে, মানুষের চলার জন্য বাস্তবিকই কোনো বাঁধানো রাজপথ নেই,– জগৎ যেমন একস্থানে বসে নেই, মানুষও তেমনি

তার পরিবর্তনশীল পরিবেষ্টনকে নিয়ে একস্থানে স্থির হয়ে নেই। আর এই পরিবর্তনশীল পরিবেষ্টনের ভিতর দিয়ে পথ করে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন অন্ধ অনুবর্তিতার নয়, সদা জাগ্রত চিত্ততার'।

অনুরূপভাবে অধ্যাপক আবুল হুসেন-এর 'আদেশের নিগ্রহ' প্রবন্ধ থেকে প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় কয়েক ছত্র তুলে ধরছি '....দেশ-কালের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য যে ধর্ম-বিধিসমূহ সৃষ্টি হয়েছিল তা কখনো সনাতন হতে পারে না। সে বিধি-বিধান কালের পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তন লাভ করতে বাধ্য, নতুবা এই পরিবর্তন মানবের নব নব প্রয়োজন তাতে মিটতে পারে না। কাজী আব্দুল ওদুদ ও অধ্যাপক আবুল হুসেন-এর বিদগ্ধ চিন্তাধারা অনুধাবন করার মতো অবস্থা ঢাকার মুসলমান সমাজের তখন ছিল না। তাই তাদের বক্তব্যের অপব্যাখ্যা হতে থাকে। আরো একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, মুসলিম সাহিত্যসমাজের এই দুই মহান চিন্তাবিদ কাজী আব্দুল ওদুদ ও অধ্যাপক আবুল হুসেন-এর ধর্ম পালন সংক্রান্ত বিশ্বাস থেকে দেখা যায়, তা আর দশজনের চেয়ে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী ও নিজস্ব স্বকীয়তায় দীপ্তিমান। তারা ধর্মের বাহ্যিক বা পার্থিব-এর চেয়ে অন্তরের অন্তর্নিহিত রূপের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। আবুল হুসেন 'নিষেধের বিড়ম্বনা' প্রবন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন ইসলামে যে সব ধর্মীয় আচার রয়েছে তা পালন করে মুসলমানরা যদি সৎ, সুন্দর, নীতিবান ও মহৎ হতে না পারে তবে ঐসব আচার পালনের প্রয়োজন ও সার্থকতা কোথায়? একজন আধুনিক সমালোচক ও গবেষক মন্তব্য করেছেন সন্দেহ নেই, ঐ প্রবন্ধে আবুল হুসেন তার অন্তরের বিক্ষোভকে চেপে রাখতে পারেননি, ফলে তার ভাষা কোথাও কোথাও হয়ত রূঢ় হয়েছে, কিন্তু সুস্থির চিত্তে যদি ভেবে দেখা হয়, তাহলে তার উত্থাপিত প্রশ্নের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। তিনি এবং কাজী আব্দুল ওদুদ মুহম্মদ (সা)-এর একটি বাণী- 'আল্লাহর গুণে বিভূষিত হও'- উল্লেখ করে আন্তরিকভাবে চেয়েছেন মুসলমানেরা এই বাণীকে তাদের জীবনে সার্থক করুক'। ঢাকার রক্ষণশীল নবাব পরিবার, প্রতিক্রিয়াশীল ও ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর প্রচণ্ড বিরোধিতা ও অশালীন আচরণের জন্য মুসলিম সাহিত্য সমাজ শুরু হবার ১০ বছরের মাথায় আর টিকে থাকতে পারেনি। আবুল হুসেন ও আব্দুল ওদুদকে হত্যার হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়। আবুল হুসেনকে শারীরিকভাবে নির্যাতন ও অপদস্থ করা হয়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি থেকে ইস্তফা দান করেন। ১৯৪৭-এর দেশ বিভাগের আগেই দুজন ঢাকা ত্যাগ করেন ও কলকাতায় পরবর্তী জীবন অতিবাহিত করেন। প্রসঙ্গত একটি বিষয় উল্লেখ করতে হয়, তৎকালীন ঢাকার নবাব পরিবার ও প্রভাবশালী সমাজপতিরা কাজী আব্দুল ওদুদ ও অধ্যাপক আবুল হুসেনের বিরুদ্ধে বিচারের আয়োজন করে। বিচারে তাদের ধর্মদ্রোহী ও দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ১৯২৮ সালের ২০ শে আগস্ট কাজী আব্দুল ওদুদকে দিয়ে নিম্নরূপ মুচলেকা সই

করে নেওয়া হয়– 'মুসলমান সমাজের উন্নতি আমি কামনা করি আর সে সম্বন্ধে যতটুকু আমার ধারণা আসে, ভাষায় তা প্রকাশ করতে চেষ্টা করি। দুঃখের বিষয় আমার ভাষা বর্তমানে অনেকেরই কাছে অদ্ভুত ঠেকেছে এবং অনেকের নিকট এমন অর্থ জ্ঞাপন করছে যা লিখবার সময় আমার স্বপ্নেরও অগোচর কথা। এর জন্য বিশেষ ব্যস্ত হওয়ার কারণ ছিল না। কিন্তু ঘটনাক্রমে আমার লেখা মুসলমান সমাজে এক ভীষণ অসন্তোষ ও মনঃক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। এর জন্য কি কথা বলে যে আমি নিজের দুঃখ, লজ্জা ও ব্যথা প্রকাশ করব তা ভেবে পাই না, খোদার দরগায় প্রার্থনা করি, যদি অজ্ঞাতসারেও আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে এমন কোনো কথা আমার কলম থেকে বার হয়ে থাকে যা সত্য ও মুসলমান সমাজের কল্যাণের পরিপন্থি তবে খোদাওন্দ করিম আমার গুনাহ মাফ করে আমাকে 'সিরাতুল মুস্তাকীমে' পৌঁছে দিন। অধ্যাপক আবুল হুসেনও নিম্নরূপ মুচলেকায় সই করতে বাধ্য হন– 'আমার ব্যবহৃত ভাষার জন্য আমার মনের কথা যদি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়া না থাকে এবং তাহা যদি আমার মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের মনে দুঃখ পয়দা করিয়া থাকে, তজ্জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। সেজন্য আমি খোদার নিকট মাফ চাই, এবং সমাজের নিকটও আশা করি আমার অপরাধ মার্জিত হইবে। হযরত মুহাম্মদ (সা) ও ইসলামের রওনক নিজের জীবনে ও আধুনিক মুসলিম সমাজে ফুটাইয়া তোলাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। আজকার দিন, আমি এই মজলিসে, খোদার নিকট প্রার্থনা করি, হে খোদা! তুমি আমাকে সেই রওনক ফুটাইয়া তোলিবার জন্য শক্তি দান কর, এবং প্রকৃত সত্য পথে (সিরাতুল মুসতাকিমে) চালিত কর।'

১৯২৬ সালে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ বুদ্ধির মুক্তির লক্ষ্যে যে রেনেসাঁসের সূচনা করেছিল, শত বাধা-বিপত্তির মুখেও তা ধ্বংস হয়নি। মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরবর্তীতে শিক্ষা-দীক্ষার প্রসারের পরিপ্রেক্ষিতে তারা প্রগতিকে মুক্তির সোপান হিসেবে বেছে নেন। মুসলিম সাহিত্য সমাজের অনুসারীদের প্রভাব বাংলার মুসলিম জনমানসকে প্রভাবিত করেছে। '৪৭ পূর্ববর্তী ও '৪৭ পরবর্তী লেখকদের অধিকাংশই ছিলেন 'শিখা' গোষ্ঠীর ভাবশিষ্য। তারাই সমাজকে আলোর পথে, মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যান। '৪৭ পরবর্তী সময়কালে আবুল ফজল, কাজী মোতাহার হোসেন ও মোতাহের হোসেন চৌধুরীসহ কবি সাহিত্যিকদের যে প্রাগ্রসর অংশটি বাঙালি জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ে কলম ধরেছিলেন, তারা হয় সক্রিয়ভাবে, নয়তো অন্য কোনোভাবে মুসলিম সাহিত্য সমাজ/শিখা গোষ্ঠীর আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। সে দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বাঙালি মুসলিম জনমানসে মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তারা অন্যতম ভূমিকাও পালন করেছিলেন।♦

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা।

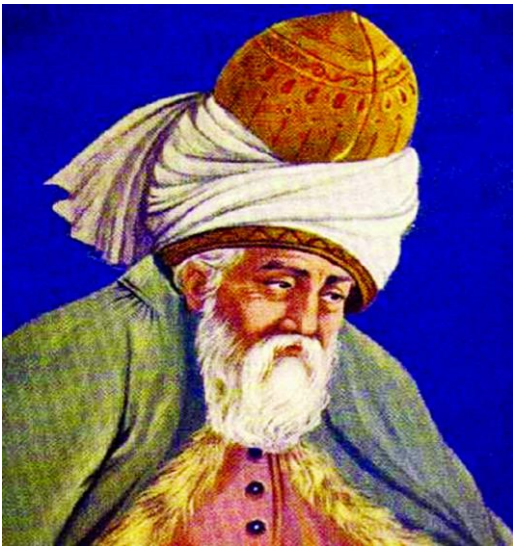

১৭ ডিসেম্বর ছিল জালাল উদ্দিন রুমির ৮১৩ তম মৃত্যুবার্ষিকী

জালাল উদ্দিন রুমি

গাজী সাইফুল ইসলাম

‘যখন মরে যাই খুঁজো না স্মৃতি পৃথিবী জুড়ে
যদি খুঁজিবার চাও খুঁজো মানুষের হৃদয় পুরে।’

তুরস্কের কোনিয়ায় অবস্থিত রুমির স্মৃতিস্তম্ভের ওপর লেখা এপিটাফ

জীবন সংক্ষেপ

পার্সিয়ান কবি ও অতীন্দ্রিয়বাদী দার্শনিক মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি (Jalaluddin Rumi), স্বদেশে যিনি মওলানা হিসেবে পরিচিত, উনিশ ও বিশ শতাব্দির শুরুতে বিশ্বের সাহিত্যমোদীদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। জাতিসংঘ কর্তৃক ২০০৭ সালকে রুমিবর্ষ ঘোষিত হওয়ার পরের ক’বছর ইউরোপে রুমির কবিতা বেস্ট সেলারের স্থান দখল করেছিল। আর তাঁকে যারা পরিচিত ও জনপ্রিয় হয়ে উঠতে সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন কোলম্যান বার্কস ও এ. জে. আরবেরি। বার্কসের অনুবাদের সুবাদেই ইউরোপে ইংরেজি ভাষাভাষী লোকদের কাছে রুমি উপস্থাপিত হন ‘নতুন যুগের পরম বিজ্ঞ’ রূপে। পরে তাঁকে

ব্যাপক পরিচিতি এনে দেন এ.জে আরবেরি। এ ছাড়াও আরও বহু পণ্ডিতের হাত দিয়ে যুগ যুগ ধরে রুমি অনূদিত হচ্ছেন।

জালালুদ্দিন রুমি জন্মগ্রহণ করেন ১২০৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর, তখনকার সময়ে তাঁর জন্মস্থানটি ছিল পার্সিয়ান প্রদেশ খোরাসানের বলখায়। বর্তমানে অঞ্চলটি আফগানিস্তানে পড়েছে। তাঁর বাবা বাহা আলদীন ছিলেন সাধারণ ধর্মীয় শিক্ষায় পণ্ডিত লোক। পেশায় শিক্ষক (অথবা ধর্মোপদেশ দাতা বা মুফতি), একইসঙ্গে একজন সুফি সাধক। আধ্যাত্ম সাধনার উদ্দেশ্যে কিছু অনুসারী নিয়ে প্রায়শই তিনি ধ্যানমগ্ন থাকতেন। তিনি চাইতেন নিজের ভূমিকা জোরদার করার মাধ্যমে এলাকার লোকদের আরও বেশি করে দীনি জীবনে উদ্বুদ্ধ করতে। কিন্তু বলখার অন্যান্য ধর্মীয় পণ্ডিত ও কাজী তাঁকে সহ্য করতে না পেরে তাঁর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হয়। তাঁরা বাহা আলদীনকে সম্মানীয় উপাধি দিতে অস্বীকার করে। এ অবস্থায় ১২০৮ থেকে ১২১২-খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনো একসময় বাহা আলদীন বলখা থেকে সমরখন্দে হিজরত করেন। জালালুদ্দিন রুমির পরিবারের বলখা ছাড়ার পেছনে আরও একটি কারণ রয়েছে বলে জানা যায়, তাহলো, পারস্য অঞ্চলে তখন চলছিল মঙ্গোলদের আগ্রাসন-নিপীড়ন। কতকটা মঙ্গোলদের হাত থেকে বাঁচার জন্য, কতকটা ভাগ্যান্বষণের জন্য বাহা আলদীন সপরিবারে বলখা ছেড়ে পশ্চিম ইরানের গমন করেছিলেন।

এর কয়েক বছর পরে সম্ভবত ১২১৬ খ্রিস্টাব্দে বাহা আলদীন পরিবার তুরস্কের কোনিয়ায় গিয়ে পৌঁছেন। দু'টি উদ্দেশ্য তাঁর মাথায় ছিল। মক্কায় গিয়ে হজ্জ করা আর আনাতলিয়ার নৃপতি শাসিত ফার্সি ভাষী কোনো অঞ্চলে স্থায়ী আবাস গড়ে তোলা। কিছুকাল পর মংগোচকের শাসক বাহারামশাহর দরবারে তাঁরা হাজির হন। বাহারামশাহর স্ত্রী একটি ধর্মীয় কলেজ (অথবা সুফি লজ) পরিচালনা করতেন। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠানে বাহা আলদীনকে চাকরি দিলেন। ওখানকার সনাতনী মাদ্রাসা তথা সুফি লজে দু'বছর ধরে তিনি পাঠ দান করেন এবং জীবনের শেষ দিন, ফেব্রুয়ারি ১২৩১ সাল পর্যন্ত ওখানেই থাকেন। উল্লেখ্য যে, জালালুদ্দিন রুমির বংশ উপাধি বালাদ হলেও তাঁর নামের সঙ্গে রুমি শব্দটি যুক্ত হয় দি রোমান শব্দ থেকে। শব্দটির আগমন ঘটে তার্কির রোমান আনাতলিয়া থেকে।

কোনিয়ায় স্থায়ী আবাস গড়ার আগে তাঁদের পরিবার কিছুদিন আমির মূসার আর্থিক সহায়তায় কারমানের লারেন্দে অবস্থান করেছিল। ওই এলাকাটি ছিল স্থানীয় সরকারের শাসনাধীন। লারেন্দে অবস্থানকালে সতেরো বছরের জালাল গৌহার খাতুনকে বিয়ে করেন এবং দুই সন্তানের জনক হন। ওখানেই তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়েছিল। ফলে তাঁর মায়ের কবরও ওখানেই রয়ে গেছে। বাহা

আলদীন মনোস্থির করলেন ছেলে জালালকে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে ধর্মোপদেশ দাতা বা মুফতি বানাবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি রুমিকে বিভিন্ন সভাসমাবেশে নিয়ে যান, তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে পরিচিত করে দেন এবং কোনিয়া শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে বক্তৃতা দেয়ার সুযোগ দেন যাতে তাঁর আত্মবিশ্বাস বাড়তে পারে। পিতার মৃত্যুর সময় রুমির বয়স ছিল অল্প। তাঁর চিন্তাভাবনা-শিক্ষাদীক্ষা তত পরিপক্ক ছিল না। যাতে তিনি পিতার আসনে সম্মানের সঙ্গে আসীন হতে পারেন। এ অবস্থায় তিনি তাঁর পিতার ভাবশিষ্য সায়েদ বুরহান উদ্দিনকে সেখানে এসে তাঁর পিতার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

সায়েদ বুরহান উদ্দিন সাময়িক সময়ের জন্য ওই দায়িত্ব নিতে রাজি হলেও শিগগিরই তিনি বুঝতে পারলেন যে, কোনিয়ার এ পদটি পাওয়ার অধিকার কেবল রুমিরই রয়েছে। এ অবস্থায় তিনি তাঁর পিতার অপর একজন শিষ্যের ওপর সে দায়িত্ব অর্পণ করে অন্যত্র আরেকটি সমান পদে চলে যান।

১২৪৪ সালের মধ্য অথবা শেষের দিক থেকে তিনি গজল লিখতে শুরু করলেন। শামসের উপস্থিতির দিনগুলোতে তিনি তাঁর বহু কবিতা শামসকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন। কিন্তু প্রথমবার শামস হারিয়ে গেলে রুমি দেখেছিলেন যে, তাঁর চিন্তাশক্তি শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর আনন্দ ফিরে এলো যখন শামস আবার কোনিয়া ফিরে এলেন। কিন্তু পরে যখন শামস তিবরিজ চিরতরে হারিয়ে গেলেন হতাশা কাটিয়ে উঠার জন্য রুমি তাঁর আধ্যাত্ম গুরুশামস তিবরিজকে নিজের মধ্যেই কল্পনা করে নিলেন। এমনকি শোনা যায়, শামসকে নিজের ভেতরে অনুভব করার জন্য রুমি এক ধরনের ড্রাগ গ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন। তারপরও তাঁর রচিত কবিতায় দেখা গেছে একজন গুরুর জন্য তাঁর ভেতরে আকাঙ্ক্ষা রয়েই গেছে। অবশ্য শেষমেষ তিনি নিজেই তাঁর কবিতাকে আধ্যাত্ম সংকট থেকে রক্ষা করলেন।

রুমি মারা যান, ১৭ ডিসেম্বর ১২৭৩। জীবনের শেষ ৩০ বছর সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে রুমি ছিলেন সবচেয়ে মেধাবী।

জালালুদ্দিন রুমির কবিতা

জীবনের গোপনীয়তা

আমাদের মৃত্যু হলো চিরন্তনের সঙ্গে আমাদের ঘর বাঁধা।
এখানে গোপনীয়তা হলো এটাই যে, আল্লাহ এক!
সূর্যালোক যখন জানালা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে ছড়িয়ে পড়ে –
এমন বহুরূপতা আরও দেখা যায় আঙ্গুর যখন থাকে গুচ্ছাকারে
কিন্তু যায় না পাওয়া আঙ্গুরের রস করে নিলে ব্লেন্ডারে।
আল্লাহর আলোয় যিনি করেন বাস, মৃত্যু মুহূর্তেও

আশীর্বাদ আর শান্তির সুধা ঝরে তাঁর আত্মার পরে।
অন্তর থেকে তাঁকে শ্রদ্ধা না করো, করো না সমালোচনা
কারণ, মৃত্যু তাকে নিয়ে যাবে সব ভালোমন্দের ওপারে।
(মিস্টিক্যাল পোয়েমস বাই রুমি থেকে, ইংরেজি অনুবাদ: এ জে আরবেরি)

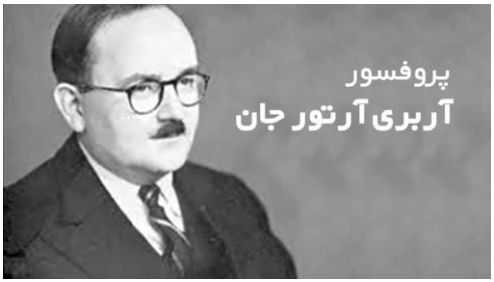

জালাল উদ্দিন রুমির কবিতার ইংরেজি অনুবাদক এ জে আরবেরি

আর্থার জন আরবেরি (Arthur John Arberry): এ জে আরবেরি নামে বিশ্বখ্যাত ও সম্মানিত এই ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ। আরবি, ফার্সি ও ইসলামিক বিষয়ের প্রাজ্ঞ বিদ্যান পণ্ডিত। জন্মগ্রহণ করেন ১২ মে ১৯০৫ ক্যামব্রিজে, পড়াশোনাও সেখানেই। প্রথমে ভর্তি হন পোর্টসমাউথ গ্রামার স্কুলে এবং পরে পামব্রোক কলেজে এবং পরে ক্যামব্রিজে। পবিত্র কুরআনেরও অনুবাদ করেছেন তিনি। একজন অমুসলিম পণ্ডিত হিসেবে তাঁর কুরআনের প্রকাশনা তখন খুবই সাড়া ফেলেছিল এবং বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশংসা কুড়িয়েছিল। চাকরি জীবনের প্রথম দিকে মিসরের কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসিকস বিভাগের প্রধানের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন কিন্তু ভালো না লাগায় ইস্তফা দিয়ে দেশে ফিরেছিলেন ইন্ডিয়া অফিসের সহকারি লাইব্রেরিয়ান পোস্টে চাকরি পাবার আশায়। যুদ্ধের সময় তিনি লিভারপুলের পোস্টাল সেন্সর নিযুক্ত হয়েছিলেন। এরপর লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে নব নির্মিত সিনেট হাউজে লন্ডন তথ্যমন্ত্রণালয়ের সহকারী হিসেবে (seconded) কাজ করেন। ১৯৪৪ থেকে ৪৭ পর্যন্ত আরবেরি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব অরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিস এসওএএস-এর পার্সিও চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে তিনি ক্যামব্রিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের স্যার থমাস অ্যাডামসের অধ্যাপক এবং ক্যামব্রিজের পামব্রোক কলেজের ফেলো হয়েছিলেন। ১৯৬৯ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল থাকেন। সমাধীস্থ হন যুক্তরাজ্যের ক্যামব্রিজের অ্যাসেনশন, প্যারিশে। বাছাই রুমি এবং মধ্যযুগীয় আন্দালুসিয়ান আরবি কবিতার গুরুত্বপূর্ণ *অ্যানথোলজি দ্য প্যানেন্টস অব দ্য চ্যাম্পিয়ন্স এন্ড দ্য স্ট্যান্ডার্ট গা দ্য ডিস্টিংগুইসড* অনুবাদ ও প্রকাশ করে তিনি পশ্চিমে বেশ সুখ্যাতি কুড়ান।

রুমির রুবাইয়াৎ

॥ ১ ॥
আমি এত ছোট যে কষ্ট করে আমাকে দেখা যায়
বড় ভালোবাসা তাহলে কীভাবে আমার ভেতরে ঠাঁই পায়?
তোমার চোখের দিকে তাকাও, দেখ, কত ছোট তারা
অথচ বিশাল বস্তু সকলই তারা সহজে দেখতে পায়।

॥ ২ ॥
ভয়ের কারণে কণ্ঠটা তোমার দিও না বন্ধ করে
দিন রাত টানো দম মৃত্যু না আসা পর্যন্ত পিছু,
থেকো বন্ধু ভালো আর মন্দ সকলের সাহচার্যে
তারা প্রত্যেকেই তোমায় দেখাবে ভিন্নরকম কিছু।
॥ ৩ ॥
যখন তুমি কাছে থাক, প্রিয়তম আমার
তুমিই ঘুমোতে দাও না আমায়,
যখন দূরে সরে যাও দু'চোখের অশ্রু
আমার–ঘুমোতে দেয় না আমায়,
হায় আল্লাহ! হৃৎপোড়ানো ভালোবাসার জন্য এই যে
রাত জাগা, এ দু'জাগরণে কতই না পার্থক্য!
॥ ৪ ॥
আমি পড়েছি তোমার প্রেমে, কী প্রয়োজন আর আমায় পরামর্শ দেয়ার?
ইতোমধেই বিষ করেছি পান আমি, কী প্রয়োজন আর মুখে ক্যান্ডি তুলে দেবার?
তারা বলে, 'তার পা বেঁধে রাখো লৌহ কঠিন শিকলে'
কিন্তু জানে না তারা, পাগল হৃদয় চাইলে সব যাবে বিফলে।
॥ ৫ ॥
তুমি চলে গেছ আর আমি কেঁদেছি রক্তাশ্রু ঝরিয়ে।
দুঃখ বেড়েছে আমার। আসলে ওটা শুধু তোমার চলে যাওয়া নয়
তুমি গেছ, তোমার সঙ্গে আমার দু'টি চোখও গেছে
এখন তুমিই বলো, আমি কাঁদব কেমন করে?
॥ ৬ ॥
আমার নেই কোনো সঙ্গী ভালোবাসা ছাড়া,
যার নেই শুরু-শেষ, নেই কোনো ভোর
অন্তরাত্মা আমার ভেতর থেকে ডেকে বলে:
'ভালোবাসায় বড় অনভিজ্ঞ তুমি, ছিঁড়ে দাও মায়া ডোর।'
॥ ৭ ॥
বলেছিলাম আমি, আমার হৃদয় চায় শুধু তোমার চুমো
তুমি বলেছিলে, 'একটি চুমোর দাম একটি জীবনের সমান'
আমার হৃদয় এসে দাঁড়াল আমার পাশে আর বলল,
'ডাউন পেমেন্টে কিনলে সস্তা বড় এটি একটি ক্যান্ডির সমান।'

॥ ৮ ॥
আমাদের কণ্ঠে দেয়া হয়েছে ভিন্ন রকম ভাষা
আর বসবাসের জন্য ভিন্ন রকম জায়গা, স্বর্গ ও নরক
যাদের হৃদয় মুক্ত আত্মাও তাদের ভিন্নরকম,
যেন ভিন্ন খনি থেকে তুলে আনা খাঁটি সোনার এক একটি আরক।
॥ ১২ ॥
যে কি না পড়বে তোমার দৃষ্টি পাঁকে
মৃত কিংবা অস্তিত্বহীন, লাভ করবেই সে জীবন।
বললে তুমি, হারিয়ে ফেলো না নিজেকে মদ-মত্ততায়–
কিন্তু রেহাই কি আছে পানকারীর উন্মত্ততা থেকে?
॥ ১৩ ॥
এক সময় আমি বলতাম, নিজের নিয়ন্ত্রক আমি নিজেই
কিন্তু ওই সময় নিজেকে একজন কয়েদ ছাড়া কিছুই মনে হতো না আমার
ওসব সময় গেছে, এখন আর নিজেকে আমি করি না বন্দি নিজে
এ থেকে এ শিক্ষাই আমি পেয়েছি যে : নিজের ওপর নিজে হতে নেই দখলদার।
॥ ১৪ ॥
বেরিয়ে এসো অন্তর থেকে যদি বিকাশ চাও তোমার অন্তরের
অগভীর জলাধারের ঘোলা স্রোত পেছনে ফেলে
প্রবাহিত হও সেই স্রোতে যা গভীর আর বিস্তৃত
হইয়ো না বলদ লাঙল বা ঘানি টানার হতে যদি পারো তারকা, ওপরের।
॥ ১৫ ॥
ওইসব শুদ্ধ মানুষ যাঁরা পৃথিবী করেছে পরিভ্রমণ
দেখো, বিস্ময়ের প্রতিভূ তারাই
তাঁদের বাইরে যা কিছু খুঁজছ তুমি
সবই পাবে তাকালে তোমার নিজের ভেতরে।
॥ ১৬ ॥
বিশুদ্ধ অভিপ্রায়ের মধ্যে যিনি পান অস্তিত্বের সন্ধান
তিনি পান না কোনো কিছু বস্তুবাদিতায়
আবার যিনি প্রত্যক্ষ করেন বৈশ্বিক অবিসম্ভাব্যতা
তিনিই পারেন চিনতে অস্তিত্বের মধ্যে অস্তিত্বহীনে।
॥ ১৭ ॥
পৃথিবী কিংবা পৃথিবীর শরীর সম্পর্কে বলো না কিছু
বানাও গল্প শুদ্ধ আয়না দিয়ে
স্রষ্টা তোমাকে দিয়েছেন এই ক্ষমতা

কেন বলো তাহলে অন্য কিছু নিয়ে?

॥ ১৮ ॥

সত্যের সব গোপনীয়তা হয় প্রকাশিত প্রশ্নে প্রশ্নে
আর সত্যিকারের ত্যাগে সব অধিকার ও গৌরব,
যখন তোমার হৃদয় ও চোখ থেকে ঝরে রক্ত কোনো বক্তব্য থেকে
কেউ-ই তখন আর পায় না নাগাল চিরন্তন মতের কিংবা পথের।

॥ ১৯ ॥

আমি হারালাম আমার পৃথিবী, আমার যশ, আমার মন-
সূর্য উঠল আর সকল আঁধার হয়ে গেল দূর।
আমি ওসবের পিছু নিলাম আর মন-প্রাণ দিলাম দৌড়ানোয়
আমার পিছু নিলো আলো আর বধ করল আমাকে।

॥ ২০ ॥

বহুবছর অপরকে নকল করে নিজেকে বোঝার চেষ্টা করেছি আমি
অন্তর থেকে, কিন্তু পারিনি, রহস্যের ঘোরটোপ আমাকে রেখেছে ঘিরে
পারিনি বুঝতে, কে যেন ডাকল নাম ধরে বহু দূর থেকে
তারপরই অন্ধ হৃদয় বন্ধ রেখে পা দিয়েছি বাহিরে।

॥ ২৫ ॥

যে মুহূর্তে প্রথম ভালোবাসার কথা শুনেছিলাম আমি
সেই মুহূর্তে হারিয়েছিলাম অন্তর-আত্মা আমার জানেন অন্তর্যামি।
বিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলাম, এটা হতে কি পারে যে,
একজন প্রেমিক আর তার প্রেমিকা ভিন্ন ভিন্ন জন?
না, তারা দু'জনে দু'দেহ কিন্তু অভিন্নজন সর্বদা
আমিই শুধু দেখেছি তাদের ভিন্ন চোখে করে আলাদা।

॥ ২৬ ॥

কিছু সময়ের জন্য আমরা বাস করি লোকদের সঙ্গে
কিন্তু বিশ্বস্ততার কোনো চিহ্ন, যেমন আমরা চাই, দেখায় না তারা
ভালো বরং নিজের অস্তিত্ব না রেখে ভেতরে ঢুকে পড়া
পানির অস্তিত্ব যেমন ধাতুতে, আগুনের অস্তিত্ব যেমন পাথরে হারা।

॥ ২৭ ॥

সুফি তাঁর হাত বাড়িয়ে দেন জগতের দিকে
বিলিয়ে দেন তাৎক্ষণিক না চেয়ে কোনো প্রত্যার্পণ
জীবিকার প্রয়োজনে যে ভিক্ষে করে রাস্তায়, নয় তার মতো
একজন দরবেশ ভিক্ষে করেন দিতে তোমাকে তার জীবন।♦

পল্লী বাংলার রূপকার কবি জসীম উদ্‌দীন

দেলওয়ার বিন রশিদ

গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষের সুখ, দুঃখ, আনন্দ-বেদনা অতি সহজভাবে ফুটিয়ে তুলে বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন কবি জসীম উদ্‌দীন। বাংলার সবুজ ঐশ্বর্যের মতই বাংলা সাহিত্যে জসীম উদ্‌দীন দেদীপ্যমান। তাঁর কাব্যের উপকরণ তিনি লোকজীবন থেকে সংগ্রহ করেছেন। গাঁয়ের সাধারণ রাখাল ছেলে, পল্লী বালা, চাষীর বউ, জেলে-মাঝি, বেদে-বেদেনির সহজ সরল জীবন আলেখ্য জসীম উদ্‌দীনের কবিতায় স্থান পেয়েছে। জসীম উদ্‌দীনই সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর কবিতায় পল্লীর মাঠ-ঘাট, শস্য ক্ষেত, নদী-নালা বালুচর, খাল-বিল আর পল্লীর সবুজের বিস্তৃত রূপ সুষমা। তাঁর কাব্যে উজ্জ্বলতা পেয়েছে গাঁয়ের সাধারণ মানুষের জীবনাচরণ ও নিসর্গ প্রকৃতি।

পল্লী প্রকৃতির মধ্যে বেড়ে উঠা পল্লীর মানুষের স্নেহ-প্রীতি, আনন্দ-উচ্ছ্বাস, দুঃখ-বেদনা অতি মমতায় অবলোকন করে জসীম উদ্‌দীন নিজস্ব ভাষা শৈলীতে বাংলা সাহিত্যে তা দীপ্তমান করেন। পল্লীর মানুষের জীবন আলেখ্য বাংলা সাহিত্যে তুলে ধরার অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য তাঁকে 'পল্লী কবি' বলা হয়।

জসীম উদ্‌দীন গ্রামে বড় হয়েছেন, গ্রামের মানুষদের ভালোবাসতেন, গ্রামের মানুষের জীবনযাপন তাঁকে বেশি আকৃষ্ট করতো, গ্রামের মানুষের কথা বলা, চাল-চলন সরলতা জসীম উদ্‌দীনকে কাছে টানতো, সবসময়ই গ্রামের ভালোবাসায় তিনি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিলেন, যে কারণে তাঁর লেখায় পল্লীর প্রতিচ্ছবি সার্থকভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। অতি নিষ্ঠায় তিনি পল্লীর মানুষের

জীবনগাঁথা বিধৃত করেছেন, যে কারণে জসীম উদ্‌দীন পল্লী কবির মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছেন।

জসীম উদ্‌দীন ১৯০৩ সালের ১ জানুয়ারি ফরিদপুর শহর সংলগ্ন তাম্বুলখানা গ্রামে মামার বাড়ি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক বাড়িও ফরিদপুর শহরের উপকণ্ঠে গোবিন্দপুর গ্রামে। কবির পিতার নাম মৌলভী আনসার উদ্দীন, মাতার নাম আমেনা খাতুন। জসীম উদ্‌দীনের পিতা ছিলেন স্কুল শিক্ষক। জসীম উদ্‌দীন পিতার একমাত্র সন্তান। কম বয়সেই পিতা আনসার উদ্দীনের কাছে জসীম উদ্‌দীনের লেখাপড়ার হাতেখড়ি হয়।

জসীম উদ্‌দীন একটু বড় হওয়ার পর তাঁকে ভর্তি করে দেয়া হয় বাড়ির কাছেই শোভারামপুর অম্বিকা পন্ডিতের পাঠশালায়। এখানে কিছুকাল পড়ালেখা করার পরে তাঁকে ভর্তি করে দেয়া হয় ফরিদপুর জেলা শহরে অবস্থিত 'হিতৈষী' মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে। সে সময় এ বিদ্যালয়ের বেশ সুনাম ছিল। পিতা আনসার উদ্দীনও হিতৈষীতে শিক্ষকতা করতেন।

হিতৈষী স্কুলে ৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়নের পর জসীম উদ্‌দীনকে ভর্তি করে দেয়া হয় ফরিদপুর জেলা স্কুলে। এ সময় জসীম উদ্‌দীনের পাঠ্যপুস্তকের কবিতা পড়ে তাঁরও কবিতা লেখার ইচ্ছে হয়। গ্রামের রহিম মোল্লা কবিগান রচনা করে জানতে পেরে তার কাছে ছুটে গেলেন, কবিতা লেখার বিষয়ে তার সাথে কথা হয়, একদিন দুজনে গান রচনা পাল্লা দিতে আগ্রহী হলেন। সত্যি একদিন দুজনের গান রচনার পাল্লা হয়। রহিম মোল্লা জসীম উদ্‌দীনের কবি প্রতিভায় মুগ্ধ হন। তিনি জসীম উদ্‌দীনকে কবিতা লেখায় উৎসাহ দিলেন। জসীম উদ্‌দীন কবিতা লেখার চর্চা করতে থাকেন। ক্রমেই তাঁর কবি খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ফরিদপুর ইশান স্কুলের ক্ষিরোদ বাবু নামে একজন শিক্ষক কবিতা লিখতেন, সেই সাথে কবিতার গুনগ্রাহীও ছিলেন। ক্ষিরোদ বাবু একদিন জসীম উদ্‌দীনের কবিতা শুনলেন। তাঁর কবিত্ব প্রতিভায় তিনি অভিভূত হলেন, তাঁকে কাছে টেনে আদর করলেন। কবিতার বই পড়তে উপদেশ দিলেন। জসীম উদ্‌দীন কবিতা লেখায় চর্চা করতে থাকেন। নিজ জেলা স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে তেমন সাড়া পাননি, বরং তিনি বেশ অবহেলার ভাব লক্ষ্য করেছেন।

১৯২১ সালে জসীম উদ্‌দীন জেলা স্কুল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৪ সালে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই.এ পাশ করেন। একই কলেজ থেকে ১৯২৯ সালে তিনি বি.এ পাশ করেন। বি.এ পাশ করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯৩১ সালে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ পাশ করেন।

জসীম উদ্‌দীন যখন দশম শ্রেণির ছাত্র, তখন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'কবর' রচনা করেন। যা ১৯২৬ সালে কল্লোল পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

কবিতাটি প্রকাশের পর পরই তিনি সব মহলে একজন প্রতিভাদীপ্ত কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর সব কবিতার মধ্যে 'কবর' কবিতাটি শ্রেষ্ঠ। এ কবিতা পড়ে ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন কবিকে লেখেন, 'দূরাগত রাখালের বংশীর ধ্বনির মতো তোমার কবিতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছে। তোমার কবিতা পড়ে আমি কেঁদেছি।'

কবি যখন বি.এ ক্লাসের ছাত্র তখন এ 'কবর' কবিতাটি মেট্রিক ক্লাশে পাঠ্যভুক্ত করা হয়। ছাত্রাবস্থায় জসীম উদ্‌দীন গ্রাম বাংলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লোকমুখে প্রচলিত ছড়া, শ্লোক, গীত সংগ্রহ করতে শুরু করেন। এ বিষয়ে তাঁকে তৎকালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন উৎসাহিত করেন। গ্রাম্য লোকগাঁথা, গীত ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে মাসিক সত্তর টাকা আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন। জসীম উদ্‌দীন ১৯৩১ সাল পর্যন্ত এ কাজে নিযুক্ত ছিলেন। পরে ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেনের অধীনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ এ্যাসিসটেন্ট হিসেবে নিযুক্তি পান এবং ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত এ পদে নিয়োজিত ছিলেন।

১৯৩৮ সালে জসীম উদ্‌দীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৩৯ সালে কবি জসীম উদ্‌দীন মাদারীপুরের মহসীন উদ্দীন খানের কন্যা মমতাজ বেগম মনিমালার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৪৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছেড়ে দেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের পাবলিসিটি বিভাগে চাকুরী নেন এবং ঢাকা ছেড়ে নতুন কর্মস্থল কলকাতায় গমন করেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনে এই পদে বহাল হন। ১৯৬১ সালে ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

জসীম উদ্‌দীন একজন মানবদরদী, উদার সাহিত্য সাধক, তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব শ্রেণীর মানুষের সুখ-দুঃখের জীবন ছবি স্বার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। দুর্দশাগ্রস্ত অসহায় মানুষ তাঁর সাহিত্যে পেয়েছে অতি দরদের সাথে স্থান। জসীম উদ্‌দীনই অবহেলিত ও নিপীড়িত মানুষের প্রকৃত রূপকার।

জসীম উদ্‌দীনের কাব্য হৃদয় ছোঁয়া, তেমনি অত্যন্ত সাবলীল ও মনোমুগ্ধকর। তাঁর স্মৃতিকথা ও আত্মজীবনীর ভাষা ও বর্ণনা অনন্য। তাঁর লেখা গান, লোকনাট্য, ভ্রমণ কাহিনী ও শিশু সাহিত্য শৈল্পিক নৈপুণ্যে অসাধারণ ও অনন্য।

জসীম উদ্‌দীনের প্রথম দুটি কাব্যগ্রন্থ 'রাখালী' (১৯২৭) ও 'নকশী কাঁথার মাঠ' পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) মন্তব্য করেন 'জসীম উদ্‌দীনের কবিতার ভাব, ভাষা ও রস সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। প্রকৃত কবির হৃদয় এই লেখকের আছে। অতি সহজ ভাষায় লেখার যাদের শক্তি নেই, এমনতর খাঁটি জিনিস তারা লিখতে পারে না।'

জসীম উদ্‌দীন সম্পর্কে ময়মনসিংহ গীতিকার সংগ্রাহক ও সম্পাদক ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন, 'আমি হিন্দু, বেদ আমার নিকট পবিত্র। কিন্তু জসীম উদ্‌দীনের কবিতা বেদের চাইতেও আমার নিকট পবিত্র। কারণ, জসীম উদ্‌দীন আমার সর্গাদর্পী গরিয়সী পল্লীগ্রামের কথা তাঁর কাব্যে লিখেছেন।'

জসীম উদ্‌দীনের অনন্য অসাধারণ সৃষ্টি সম্ভার যেমন বাংলা সাহিত্যের ভান্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ, তেমনি পাঠক হৃদয়ে তিনি অমর হয়ে রয়েছেন। তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছেঃ রাখালি (কবিতা- ১৯৩০), ধান ক্ষেত (কবিতা- ১৯৩১), সোজন বাদিয়ার ঘাট (কাহিনী কাব্য- ১৯৩৩), রঙিলা নায়ের মাঝি (গানের সংকলন- ১৯৩৫), হাসু (কিশোর কবিতা- ১৯৩৮), রূপবতী (কবিতা- ১৯৫১), বেদের মেয়ে (লোকনাট্য- ১৯৫১), মধুমালা (লোকনাট্য- ১৯৫১), বাঙ্গালীর হাসির গল্প ১ম খন্ড, শিশু সাহিত্য- ১৯৬০, ডালিম কুমার (শিশু সাহিত্য- ১৯৬০), ঠাকুর বাড়ীর আঙিনায় (স্মৃতিকথা- ১৯৬১), সুচয়নী (কবিতা- ১৯৬১), সুচয়নী (কবিতা- ১৯৬১), গল্প স্বল্প (শিশু সাহিত্য- ১৯৬২), মা যে জননী কান্দে (কাহিনীকাব্য- ১৯৬৩), জীবন কথা (স্মৃতিকথা- ১৯৬৪), বোবা কাহিনী (উপন্যাস- ১৯৬৪), বাঙ্গালীর হাসির গল্প (২য় খন্ড, শিশু সাহিত্য- ১৯৬৪), কত গল্প কত কথা (শিশু সাহিত্য- ১৯৬৭), জলের লেখন (কবিতা- ১৯৬৯), ভয়াবহ সেইদিনগুলিতে (কবিতা- ১৯৭২), বউটু বানীর দুল (উপন্যাস- ১৯৯০), যমুনাবতী (কিশোর কবিতা- ২০০১) ইত্যাদি।

শিশু-কিশোরদের জন্য জসীম উদ্‌দীন প্রচুর লিখেছেন। তাঁর লেখায় শিশু-কিশোরদের মনের খোরাক সবচে বেশি ছিল। তার প্রতিটি লেখায় ছিল আন্তরিক মমতার স্পর্শ। দরদ দিয়ে শিশু-কিশোরদের জন্য সহজ সরল ভাষায় লিখেছেন হৃদয় ছোঁয়া ছড়া. কবিতা, হাসির গল্প। ১৯৩৮ সালে শিশু-কিশোরদের ছড়া-কবিতার বই 'হাসু' কলকাতার ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। ছোটদের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার পাশাপাশি শিশু মনের রহস্য উপলব্ধি সূক্ষ্ম অর্ন্তদৃষ্টিও এতে প্রতিফলিত হয়েছে। 'হাসু'র প্রতিটি ছড়া-কবিতায় শিশু-কিশোরদের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়–

"আমার বাড়ী যাইও ভোমর/ বসতে দেব পিড়ে/ জলপান যে করতে দেব/ শালি ধানের চিড়ে।/ আমার বাড়ী যাইও ভোমর/ এই বরাবর পথ/ মৌরী ফুলের গন্ধ শুকে/ থামিও তব রথ।"/ অথবা 'আলাপন' কবিতায় কবি বলছেন-

"এই খুকীটি আমায় যদি একটু আদর করে/ একটু ছোট কথা শোনায় ভালবাসায় ভরে/ তবে আমি বেগুন গাছে টুনটুনীদের ঘরে/ যত নাচন ছড়িয়ে আছে আনব হরণ করে।"/ কিংবা 'খুকীর সম্পত্তি' ছড়ায়,/ "শিউলি নামের খুকীর সনে আলাপ আমার অনেকদিনের থেকে/ হাসি খুশি মিষ্টি মিশি অনেক কথা কইবে

তারে ডেকে।"/ 'হাসু' গ্রন্থের অন্য একটি কবিতা 'মামার বাড়ী', যা খুবই পরিচিত এবং প্রিয়,/ "আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা ফুল তুলিতে যাই/ ফুলের মালা গলায় দিয়ে মামার বাড়ি যাই।"

জসীম উদ্‌দীনের এমন সহজবোধ্য অনেক ছড়া-কবিতা শিশু-কিশোরদের হৃদয়ে গাঁথা রয়েছে। ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয় জসীম উদ্‌দীনের 'এক পয়সার বাঁশি'। এতে নিঃস্ব, রিক্ত অসহায় হতদরিদ্র শিশু-কিশোরদের কথা তুলে ধরেছেন। জসীম উদ্‌দীনের শিশুতোষ প্রতিটি গ্রন্থই অনন্য অসাধারণ।

বাংলা ও বাঙালির প্রতিনিধিত্বকারী গ্রামীণ সমাজ ও গ্রাম বাংলার জীবনাচরণ, লৌকিকতা, নিসর্গ প্রকৃতির বিস্তৃত সৌন্দর্য সুষমা, প্রকৃতির অন্তর্নিহিত কথকতা জসীম উদ্‌দীনই সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং হৃদয় স্পর্শী ভাষায় পাঠক হৃদয়ে গেঁথে দিয়েছেন একমাত্র জসীম উদ্‌দীনই। যা অন্য আর কেউ পারেনি। এ কারণে জসীম উদ্‌দীন তাঁর সৃষ্টি সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতা জসীম উদ্‌দীনের কবিতায় অতি নিষ্ঠায় উঠে এসেছে। তাঁর 'ভয়াবহ সেই দিনগুলোতে' গ্রন্থের মুক্তিযুদ্ধের কবিতাগুলি খুবই হৃদয় ছোঁয়া।

কবি জসীম উদ্‌দীন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ৭০ লাইনের দীর্ঘ একটি কবিতা লিখেছেন। কবিতাটি হৃদয় দিয়ে অত্যন্ত আবেগঘন ভাষায় লিখেছেন। কবিতাটির অংশ বিশেষ তুলে ধরা হলো:

মুজিবুর রহমান/ এই নাম যেন বিসুভিয়াসের অগ্নিউগারী বান।/ বঙ্গদেশের এ প্রান্ত হতে সকল প্রান্ত ছেয়ে/ জ্বালায় জ্বালিয়ে মহাকালানল ঝঞ্ঝা অশনি বেয়ে;/ বিগত দিনের যত অন্যায়, অবিচার ভরা যার;/ হৃদয়ে হৃদয়ে সঞ্চিত হয়ে সহ্যের অঙ্গার;/ দিনে দিনে হয় বর্ধিত স্ফীত শত মজলুম বুকে/ দগ্ধিত হয়ে শত লেলিহান দিল প্রকাশের মুখে,/ তাহাই যেন বা প্রমূর্ত হয়ে জ্বলন্ত শিখা ধরি/ ওই নামে আজ অশনি দাপটে ফিরিছে ধরণী ভরি.../ *(বঙ্গবন্ধু, রচনা- ১৯৭১)*

কবিতাটি হৃদয়স্পর্শী ও পাঠকপ্রিয়। বাঙালির চিরকালের স্বপ্ন আশা ও সংগ্রামের সমন্বয়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কে নিয়ে লেখা জসীমউদ্দীনের এ কবিতাটির ভাষা বর্ণনা অত্যন্ত সুন্দর ও অসাধারণ।

পল্লীর মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ দুঃখ ও বিরহ বেদনা আর গ্রাম বাংলার সৌন্দর্য সুষমার অনন্য রূপকার জসীম উদ্‌দীন ১৯৭৬ সালে ১৪ মার্চ মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু তিনি তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালী হৃদয়ে চির ভাস্বর হয়ে আছেন।♦